বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কমপিউটার জগৎ

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the ICT Movement in Bangladesh

জুলাই ২০২৪ বছর ৩৪ সংখ্যা ০৩

July 2024 YEAR 34 ISSUE 03

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা অত্যন্ত জরুরি

আধুনিক প্রযুক্তির আবাসন শহর স্মার্ট সিটি

কমপিউটার জগৎ-এর খবর

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

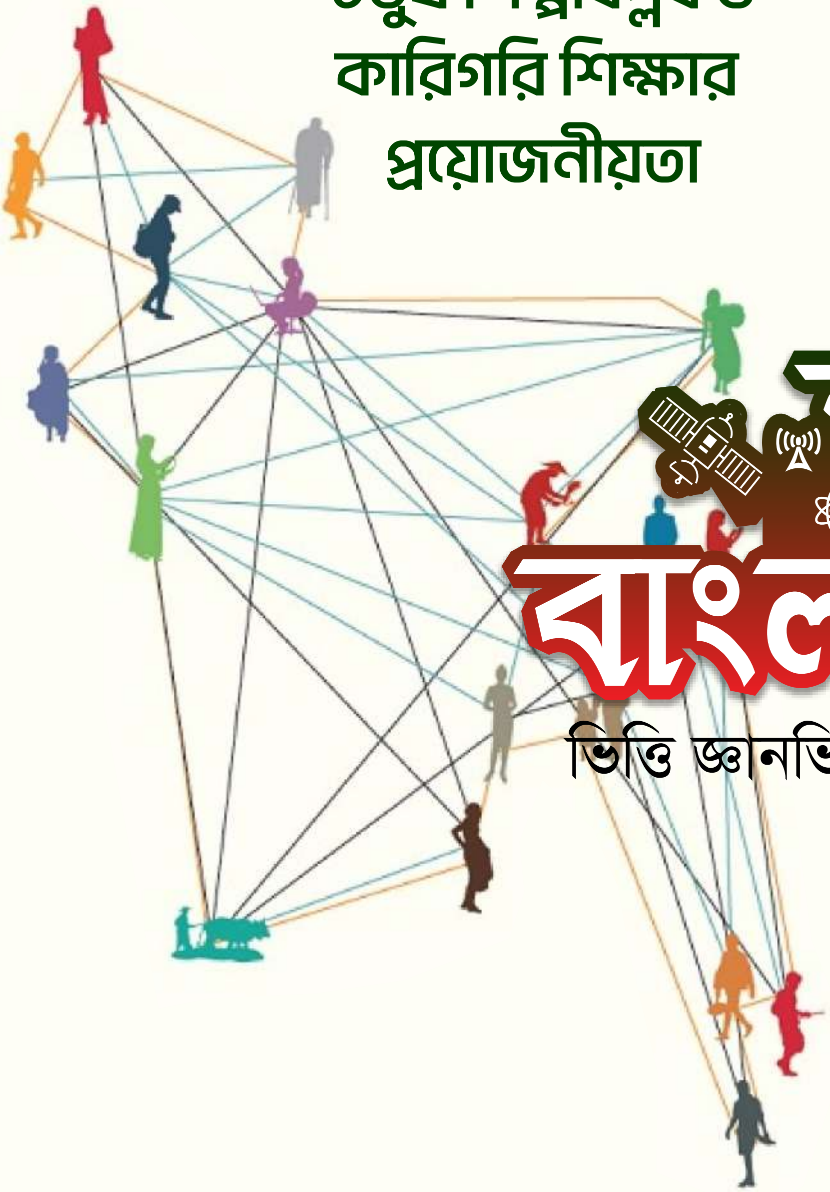

স্মার্ট বাংলাদেশের

ভিত্তি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি

Lexar

INDUSTRY-LEADING
MEMORY SOLUTIONS

FLASH DRIVE | SSD | RAM

Global Brand

কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা	ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন
নির্বাহী সম্পাদক	মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু
প্রধান নির্বাহী	মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক	নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী	সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি	ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি

জামাল উদ্দীন মাহমুদ	আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা	কানাডা
ড. এস মাহমুদ	ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান	জাপান
এস. ব্যানার্জী	ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা	সিঙ্গাপুর

প্রচ্ছদ	সমর রঞ্জন মিত্র
ওয়েব মাস্টার	মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী	মনিরুজ্জামান সরকার পিন্টু
অঙ্গসজ্জা	সমর রঞ্জন মিত্র
রিপোর্টার	স্থপতি বদরুল হায়দার
রিপোর্টার	সোহেল রানা

মুদ্রণে : মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

অর্থ ব্যবস্থাপক	সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক	সাজ্জাদ হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক	প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের

যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Executive Editor	Mohammad Abdul Haque Anu
Chief Executive	Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent	Md. Abdul Hafiz
Correspondent	Md. Masudur Rahman

Published from :
Computer Jagat
Room No. 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : info@computerjagat.com.bd

সম্পাদকীয়

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা অত্যন্ত জরুরি

তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতিতে মানুষের জীবন দিন দিন হয়ে উঠছে সহজ ও গতিশীল। আর এ গতিশীল পথ সহজ করার অন্যতম উপায় হলো দ্রুতগতির নেটওয়ার্কিং সিস্টেম। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু দেশে সাবমেরিন কেবলের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। যে কারণে কোনো একটি কেবল কাটা পড়লে কিংবা কোনো কারণে সাময়িক বন্ধ থাকলে ইন্টারনেট সেবা ব্যাহত হয়। সম্প্রতি 'সি-মি-উই ৫' সাবমেরিন কেবল ইন্দোনেশিয়া অংশে কাটা পড়েছে। এতে বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশ এ কেবলে যুক্ত থাকলেও সেবা ব্যাহত হচ্ছে শুধু বাংলাদেশে। খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, এর পেছনে দায়ী অপর্যাপ্ত সাবমেরিন কেবলের ওপর নির্ভরশীলতা। একাধিক বিকল্প না থাকায় যেকোনো দুর্ঘটনায় দেশে ইন্টারনেট সেবা ব্যাহত হয়। বাকি দেশগুলোয় পর্যাপ্ত বিকল্প সাবমেরিন কেবল থাকায় এ সেবা ব্যাহত হচ্ছে না। দেশে সাবমেরিন কেবল মোটে দু'টি। প্রথম সাবমেরিন কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-মধ্যপ্রাচ্য-পশ্চিম ইউরোপ ৪ 'সি-মি-উই ৪'। বর্তমানে সমুদ্রের তলদেশের এই কেবলের মাধ্যমে প্রায় ৮০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ সরবরাহ করা হয়, যা ২০০৬ সালে বাংলাদেশে সংযুক্ত হয়েছিল।

আর দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল 'সি-মি-উই ৫'। এর সক্ষমতা ১ হাজার ৬০০ জিবিপিএস, যা দেশের প্রথম সাবমেরিন কেবলের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। 'সি-মি-উই ৫' কেবলটি সিঙ্গাপুর থেকে ৪৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে ইন্দোনেশিয়া অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যায় সিঙ্গাপুর অভিমুখী সব ধরনের ট্রাফিক। এ অবস্থায় দেশের ৯০ শতাংশ ডাটা ট্রাফিক সিঙ্গাপুরভিত্তিক হওয়ায় এবং অধিকাংশ কোম্পানি সিঙ্গাপুরের সার্ভার ব্যবহার করায় ইন্টারনেট সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে, বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে দেশে ইন্টারনেট সেবাপ্রাপ্তিতে।

এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে কেবলের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। কেবলের সংখ্যা বেশি হলে সেগুলো দিয়ে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। পাশাপাশি সার্ভার বেছে নেয়ার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। দেশে সার্ভার স্থাপন করা যায় কিনা তা নিয়ে কাজ করা জরুরি। আমাদের প্রায় সব ডাটা সেন্টার সিঙ্গাপুরভিত্তিক। ফলে ৯০ শতাংশ ডাটা ট্রাফিক সিঙ্গাপুরকে ঘিরে হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় কেবল কাটা পড়ায় সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত ডাটা ভারত হয়ে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। টেলিযোগাযোগ খাতের বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান টেলিজিওগ্রাফির তথ্য অনুযায়ী, 'সি-মি-উই ৫'-এর সঙ্গে ১৬টি দেশ ১৮টি ল্যান্ডিং স্টেশনের মাধ্যমে যুক্ত। ১৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশই সবচেয়ে কম সাবমেরিন কেবলে যুক্ত। টেলিজিওগ্রাফির হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার চারটি সাবমেরিন কেবলে যুক্ত। মালয়েশিয়া সাবমেরিন কেবলের ল্যান্ডিং স্টেশন ২৯টি।

সিঙ্গাপুর যুক্ত ৩৮টিতে আর ইন্দোনেশিয়া নিজে ৬৫টি কেবলের মাধ্যমে সংযুক্ত। এছাড়া শ্রীলংকা ও পাকিস্তান যথাক্রমে নয়টি ও দশটি সাবমেরিন কেবলে যুক্ত। বাংলাদেশেও সাবমেরিন কেবলের সংখ্যা বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। কেননা ইন্টারনেটের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও জড়িত। শিগগিরই এ সমস্যা সমাধান না হলে এবং এর বিকল্প তৈরি না হলে অর্থনৈতিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সাধারণ ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট ব্যবহারে খুব বেশি সমস্যার সম্মুখীন না হলেও ফ্রিল্যান্সার এবং দেশের বাইরের কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করা কোম্পানিগুলোর কাছে নিরবচ্ছিন্ন সেবা না পাওয়া বেশ ভোগান্তির। এতে আর্থিকভাবে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দেশে ব্যান্ডউইডথের চাহিদা এবং জোগান সমপর্যায়ে রয়েছে। ফলে একদিকে আমাদের কোনো উদ্বৃত্ত নেই, অন্যদিকে আমাদেও কোনো বিকল্প সোর্স নেই। যার কারণে দু'টি কেবলের একটি কাটা পড়ায় এ সংকট তৈরি হয়েছে এবং এটি দীর্ঘায়িত হবে।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবলস কোম্পানি (বিএসসি) সূত্রে জানা যায়, বিচ্ছিন্ন হওয়া কেবল মেরামত করতে ইন্দোনেশিয়া সরকারের অনুমতি লাগবে। সবকিছু ঠিকঠাক করে ইন্টারনেটের গতি ফিরে পেতে প্রায় অনেক সময় লাগে।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ

cudy
WHOLE HOME MESH
300Mbps Multi-Mode
5 in 1 Mesh Router
Router | Access Point | Extender | WISP | Mesh Satellite Multi-mode
5-In-1 Multi-Mode
WIREGUARD
2x2MIMO
MODEL WR300
cudy
Call For Details:
+880 1977 476 546
Global Brand

কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT Leading the IT movement in Bangladesh
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
জুলাই ২০২৪ বছর ৩৪ সংখ্যা ০৩

সূচিপত্র

Advertisers' INDEX
02 Global Brand
04 Global Brand
46 UCC

৩. সূচিপত্র

৫. সম্পাদকীয়

৬. স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি

একবিংশ শতাব্দীর এ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বিশ্বদরবারে দাঁড়াতে চাইলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তথা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশের জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান এ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জ্ঞানের ভিত্তিতেই কেবল এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে একটি উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্বের দক্ষতা, মানবিকতায় শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বেই প্রতিষ্ঠিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ ছিলো প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বপ্নের নাম; বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সব সুবিধা আজ আমাদের হাতের নাগালে। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে আমাদের এ অবস্থানে পৌঁছানোর পথ খুব সহজ ছিল না। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন রূপকল্প ২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন, ঘোষণা দেন রূপকল্প ২০২১-এর, সে সময় তথ্যপ্রযুক্তিতে আমাদের দেশের অবস্থান ছিল পেছনের সারিতে। ওই সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার এ প্রস্তাবনা ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ডিজিটাল বাংলাদেশ মূলত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। ডিজিটাল প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে শক্ত অবস্থানে পৌঁছেছে। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ তার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে।

সারা বিশ্ব এ মুহূর্তে একটি প্রযুক্তিগত এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনমানকে আরও সহজতর করা। এর ফলে আমাদের জীবনযাত্রা এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ ও পদ্ধতিগুলো মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

১২. চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে এ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় এক কোটি ৪৯ লাখ মানুষ বিদেশে কর্মরত আছেন। যাদের ৮৮ শতাংশই কোন ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়া অর্থাৎ প্রায় এক কোটি ৩২ লাখ প্রবাসীর কাজের কোন প্রশিক্ষণ নেই। আর বাকি ১২ শতাংশ প্রবাসী কারিগরি শিক্ষা, ভাষা, কম্পিউটার ও ড্রাইভিং-এ চারটির কোন একটির ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রবাসীদের মধ্যে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ডিগ্রিধারীর সংখ্যা খুবই কম।

বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা সামনে আসছে। এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা মাথায় রেখেই আমাদের দক্ষ কর্মজ্ঞান সম্পন্ন লোকবল সৃষ্টি করছে সরকার। দেশের মানুষকে কারিগরি ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দক্ষ করে তুলতে হবে। যাতে তারা পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে। দক্ষ জনশক্তি আমাদের দেশের উন্নয়ন খাতে অবদান রাখতে পারবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছেন। আমাদের বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে হবে। প্রযুক্তির নানা বিকাশ, শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির রাজত্ব গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কাঠামোয় এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এখন বিশ্বব্যাপী কারিগরি জ্ঞানের কদর খুব সহজেই চোখে পড়ে। জনশক্তি খাত থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে বর্তমানে তা আরও কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

১৮. আধুনিক প্রযুক্তির আবাসন শহর স্মার্ট সিটি

জাতিসংঘ প্রত্যাশা করছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শহরে বসবাস করবে। ২০১৫ সালে বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিএসএস) এজেন্ডা বিষয়ে একমত হয়, যা জাতিসংঘ দ্বারা স্বীকৃত। যার মধ্যে ১১ নম্বর গোল বা লক্ষ্য ছিল, সাসটেইনেবল সিটিস এবং কমিউনিটিস। এতে শহর এলাকাকে প্রযুক্তি নির্ভর সুন্দর একটি শহরে পরিণত করা উচিত, যা ছাড়া এই এসডিএসএস লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। আর 'স্মার্ট সিটি'র প্রয়োজনীয়তা সেখানে, যেখানে মানুষ পাবে প্রযুক্তি নির্ভর একটি বাসযোগ্য শহর। যেই শহরে ইলেকট্রনিক ডাটা সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষ এবং অবকাঠামোর মধ্যে একটি সময় উপযোগী মেলবন্ধন গড়ে তুলে শহরের মানুষকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দিবে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **নাজমুল হাসান মজুমদার**।

২৭. কমপিউটার জগৎ খবর

স্মার্ট বাংলাদেশের

ভিত্তি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি

একবিংশ শতাব্দীর এ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বিশ্বদরবারে দাঁড়াতে চাইলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তথা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশের জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান এ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জ্ঞানের ভিত্তিতেই কেবল এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে একটি উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্বের দক্ষতা, মানবিকতায় শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বেই প্রতিষ্ঠিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ ছিলো প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বপ্নের নাম; বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ।

হীরেন পণ্ডিত

ডিজিটাল বাংলাদেশ মূলত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। ডিজিটাল প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে শক্ত অবস্থানে পৌঁছেছে। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যে সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ তার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে।

সারা বিশ্ব এ মুহূর্তে একটি প্রযুক্তিগত এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনমানকে আরও সহজতর করা। এর ফলে আমাদের জীবনযাত্রা এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ ও পদ্ধতিগুলো মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সবকিছুই ইন্টারনেট ও ইন্টারনেটকেন্দ্রিক স্মার্ট ডিভাইসের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া শুধুমাত্র প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নয়, আমাদের জীবনধারণের সব ক্ষেত্রকেই পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আর একটি সময়োপযোগী পরিকল্পনা হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্প। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্পের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই বছরের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন, ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের, যার মূল স্তম্ভ হবে চারটি- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সমাজ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশবান্ধব পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল গ্রহণে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ : আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন, ন্যানোটেকনোলজি, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের মতো আধুনিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, পরিবহন, পরিবেশ, অর্থনীতি, গভর্ন্যান্সসহ বিভিন্ন খাত অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্পের কর্মপরিকল্পনায় স্থান পাচ্ছে তারুণ্যের মেধা, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবনী জাতি গঠন। চারটি মূল ভিত্তির ওপর নির্ভর করে ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা সর্বত্র প্রযুক্তিনির্ভর। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে অন্যতম সিদ্ধান্ত হলো- ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর ভালনারেবল এক্সেপশন (ডাইভ)-এর আওতায় আত্মকর্মসংস্থান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ; 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম'-এর আওতায় শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করা; স্মার্ট সরকার গড়ে তুলতে ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি স্থাপন। রোবটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ যুগে আমাদের সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রমনির্ভর আমাদের যে অর্থনীতি, তাতে প্রযুক্তিতে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে তার বিকল্প উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ধীরে ধীরে বিশ্বজুড়ে শ্রমনির্ভর কাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে এবং বাড়তে থাকবে। এই প্রযুক্তির বিশ্বব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য, মধ্যম থেকে উন্নত বাংলাদেশ

বিনির্মাণে মেধা ও জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি কতটা কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও কর্মঠ জনশক্তি। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। বিশ্বব্যাংকের মতে, জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির চারটি মূল স্তম্ভ রয়েছে। তা হলো- প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়, ল্যাবরেটরিজ, ইনকিউবেটরস ইত্যাদি, উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম, মানসম্মত শিক্ষা এবং পর্যাপ্ত ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো।

এই চারটি স্তম্ভ ব্যাপক পরিসরে দক্ষ জনবল তৈরিতে, উদ্যোক্তাদের পণ্য ও সেবার মানোন্নয়নে কাঠামোগত সুবিধা দেবে। পরিবর্তিত এই অর্থনীতিতে দেশের শ্রমবাজারে সমন্বয় ও পুনর্বিন্যাস ঘটবে। সেই পরিবর্তিত শ্রমবাজারে টিকে থাকতে হলে দেশের জনগণকেও হতে হবে 'স্মার্ট' ও দক্ষ। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে তাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রচলিত ধারার শিক্ষায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জ্ঞানকর্মী বানাতে হলে প্রথমে প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলাতে হবে। আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীলতা ও কায়িক শ্রম কমিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষ তথা জ্ঞানকর্মীতে রূপান্তর করতে হবে।

এই জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে জ্ঞানচর্চার কোনো বিকল্প নেই। আগামী বছরগুলোয় সারা বিশ্বে কোন ধরনের কাজের চাহিদা বাড়তে পারে, কোন ধরনের কাজের চাহিদা কমতে পারে, সে বিষয়টি মাথায় রেখে দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত ও শিক্ষাগত রূপান্তরও করতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ওকলার জুলাই ২০২৩-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের ১৪৩টি দেশের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেটের গতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম। আর ফিক্সড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৬তম। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন আমাদের প্রয়োজন উচ্চগতিসম্পন্ন, সাশ্রয়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, যা দেশজুড়ে বিস্তৃত থাকবে। সেই সঙ্গে সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) আইসিটি জরিপ ২০২২-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৩৮ দশমিক ৯ শতাংশ। জিএসএমএ, লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত দ্য মোবাইল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শতকরা ৮৬ শতাংশ পুরুষের মোবাইল ফোন আছে, যেখানে নারী মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬১ শতাংশ; অর্থাৎ ২৯ শতাংশ লিঙ্গবৈষম্য এখানে বিদ্যমান রয়েছে। মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে

লিঙ্গবৈষম্য আরও প্রকট; যা প্রায় ৫১.৫ শতাংশ। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে এ লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের নারী সমাজকে পেছনে রেখে কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

ইতোমধ্যে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করেছেন। সামনে লক্ষ্য- স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১। দেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব বলে আমরা আশাবাদী।

একটি দক্ষ ও ডিজিটাল-প্রস্তুত কর্মীবাহিনী এবং প্রযুক্তি-সমর্থিত কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ তৈরি করে একটি স্মার্ট অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর পাঁচ লাখেরও বেশি স্নাতক তৈরি হচ্ছে, যার মধ্যে প্রায় পঁচাত্তর হাজার তথ্য প্রযুক্তি-সক্ষম পরিষেবা (আইটিইএস) প্রাপ্ত পেশাদার জনশক্তি হিসেবে প্রশিক্ষিত। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের মতে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অনলাইন কর্মীর পুল রয়েছে বাংলাদেশে। প্রায় ৬ লাখ ৮০ হাজার ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিং সেক্টও থেকেপ্রায় ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে। এক হাজার পাঁচশত কোটি টাকা বিনিয়োগে সারা দেশে নির্মিত ৩৯টি হাই-টেক বা আইটি পার্কের মধ্যে ৯টিতে ১৬৬টি দেশি-বিদেশি কোম্পানি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ সবেতন কর্মসংস্থানে এবং ৩২ হাজার দক্ষ কর্মী জনশক্তির পুলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ ছাড়া আইসিটি খাতে ২০ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ হাজার নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। দ্রুত বর্ধনশীল আইসিটি শিল্প মানুষকে আর্থিক, টেলিযোগাযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১২০টিরও বেশি কোম্পানি ৩৫টি দেশে প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের আইসিটি পণ্য রপ্তানি করছে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ এটি ৫ বিলিয়নে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও ৩০০টি স্কুল, ১ লাখ ৯০ হাজার ওয়াই-ফাই সংযোগ, এবং ২৫০০টি ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে শতভাগ অনলাইন পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি বড় মাপের আইসিটিনির্ভর কর্মসংস্থানের ৩ কোটি জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। আইসিটি শিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের একটি স্মার্ট অর্থনীতিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

স্মার্ট বাংলাদেশের চতুর্থ স্তম্ভ হলো একটি স্মার্ট সোসাইটি গঠন, যার অর্থ তথ্য-সমাজ থেকে জ্ঞান-সমাজে রূপান্তর। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা একটি তথ্য সমাজের মৌলিক গুণাবলি অর্জন করেছি। এখন সময় এসেছে জীবনব্যাপী শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব উন্নয়নের জন্য জ্ঞান তৈরি এবং প্রয়োগের নিমিত্তে তথ্য শনাক্তকরণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, রূপান্তর, প্রচার এবং ব্যবহার করার স্থায়ী দক্ষতা অর্জনের। সে জন্য দরকার একটি শক্তিশালী সামাজিক দর্শন, যেখানে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংহতি এবং নাগরিক অংশীদারত্বের সুসমন্বয় থাকে। এগুলোই একটি স্মার্ট সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশ সেদিকেই এগোচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ১৪টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প যেমন ডিজিটাল শিক্ষা, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, ডিজিটাল কৃষি ইত্যাদি নিশ্চিত করেছে, তেমনি স্মার্ট বাংলাদেশের অপরিহার্য উপাদান হবে স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট ট্রেড, স্মার্ট পরিবহন এবং স্মার্ট ব্যবস্থাপনা নীতি। ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল সমাপ্তির মাধ্যমে প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা

স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে পথ দেখাবে, যা বাংলাদেশের উন্নয়নের মাঠে একটি বড় উল্লম্ফন। আমরা যদি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আমাদেও ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি ও অপ্রতিরোধ্য দেশ গড়তে চাই, তাহলে শেখ হাসিনার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সাধারণ মানুষকে স্নেহ-ভালোবাসায় সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার পিতার মতোই বাংলার মানুষকে ভালোবাসেন, বাংলার মানুষের মুক্তি ও উন্নয়ন কামনা করেন। তবে শেখ হাসিনার পক্ষে একা বাংলার মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের সচেতন করে তোলা কঠিন। তাই আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল মানুষের উচিত এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা।

স্মার্ট বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব বাস্তবায়নে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে আসতে হবে এবং কাজকরতে হবে। বাংলাদেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলা রূপে গড়ে তুলতে নিরলস পরিশ্রম করেন বঙ্গবন্ধু। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব বাস্তবায়ন এখন সবার আলোচনার বিষয়। বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা, দুর্নীতি, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক স্বনির্ভর এক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করার জন্য ডাক দিয়েছিলেন ‘সবুজ বিপ্লব-এর। তাঁর সেই সবুজ বিপ্লবের স্বপ্ন এখন কৃষি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষকরা ঝড় জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও খরাসহ সব ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করেও দ্বিগুণ দৃঢ়তা ও শক্তি দিয়ে কৃষির অগ্রগতি বজায় রেখেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭ শতাংশের বেশি কৃষিকাজে নিয়োজিত। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশকসহ সব ধরনের কৃষি উপকরণ ব্যবহার করে তারা জমি ক্ষয়ের পরও কয়েকগুণ বেশি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশের ১০ শতাংশ জমি উচ্চ ফলনশীল ফসলের আওতাধীন ছিল। এখন তা ৯০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। ১০ শতাংশ জমি সেচের আওতায় ছিল, এখন তা ৮০ শতাংশ। ফলে ধানের উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণ, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচ গুণ ও ভুট্টা দশ গুণ।

বর্তমানে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, খোলা পানিতে মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয়, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে সপ্তম এবং পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থানে রয়েছে। ইলিশ উৎপাদনের প্রথম। হাঁস-মুরগি এবং দুগ্ধ খাতে ঈর্ষণীয় সাফল্য। এসবই সম্ভব হয়েছে কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলায় খাদ্য সংকট সাড়ে ৭ কোটি মানুষের হলেও মোট ফসল উৎপাদন হচ্ছে ১ কোটি টন। ৫৩ বছর পর বাংলাদেশে প্রায় ১৭ কোটি মানুষ। ফসল উৎপাদন চার কোটি টনে পৌঁছেছে। ঘাটতির বাংলাদেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। সকল বাধা অতিক্রম করে, কঠোর পরিশ্রম ও ঘামের মাধ্যমে কৃষির প্রায় সকল উপখাতে কৃষকের মন ও আত্মার জয়জয়কার। ৫৩ বছর ধরে শ্রমজীবী মানুষ সমৃদ্ধির চাকাকে পেছন থেকে ঠেলে দেশের অর্থনীতির ভিত তৈরি করেছে। শত প্রতিকূলতার মাঝেও তারা বাংলাদেশের পোশাক খাতের অগ্রগতি করেছে অপ্রতিরোধ্য। লাল-সবুজের পতাকা বিশ্বের শীর্ষে উত্তোলন করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক কোটি ২০ লাখ ৫৬ হাজার অভিবাসী শ্রমিক তাদের পরিশ্রমের প্রায় পুরো আয় দেশে পাঠিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন উন্নয়নের পথে।

কৃষি গবেষণায় কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সাফল্য অনেক ভালো। বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার কৃষি বিজ্ঞানী এ দেশের মানুষকে আলোর পথ দেখাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবের উদ্যোগ না নিলে এবং কৃষি উৎপাদনের ভিত্তিমূল তৈরি না করলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা আজকের এই অবস্থানে আসতে পারত না আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন শতাব্দীর মহানায়ক। এরপর তিনি দেশগঠনের অংশ হিসেবে যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জমির মলিকানার সীমা নির্ধারণ করে সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলেন। আমাদের কৃষি জমি যেভাবে কমছে, সেক্ষেত্রে তার সবুজ বিপ্লবনীতি এখনো প্রাসঙ্গিক। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করে স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করার জন্য মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সময়ের হিসেবে এই সামান্য কয়েকটি বছরে বঙ্গবন্ধুর যে অসাধারণ কর্মতত্পরতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তার অনন্যসাধারণ রাষ্ট্রনায়কসুলভ প্রতিভা এবং অসাধারণ কর্মদক্ষতার পরস্ফুটন আমরা দেখতে পাই।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাদেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলা রূপে গড়ে তুলতে নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ক্ষুধা, দুর্নীতি, দারিদ্র্যমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক স্বনির্ভর এক উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে ডাক দিয়েছিলেন ‘সবুজ বিপ্লব’-এর। তার সেই সবুজ বিপ্লবের স্বপ্ন এখন কৃষি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। কৃষি গবেষণায় কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সাফল্য তারই অনুপ্রেরণার ফসল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের কতিপয় উচ্চাভিলাষী, পথভ্রষ্ট সামরিক কর্মকর্তার নির্মম হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে তার এই অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হলেও বাংলাদেশ গত দেড় যুগে কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফিরে আসার পর শেখ হাসিনা শোককে শক্তিতে পরিণত করে দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। দেশি-বিদেশি সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে তিনি তার পিতার অসমাপ্ত কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। আজ তাঁরই নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বদরবারে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ভবিষ্যতে তারই হাতে পিতা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন সফল হবে, ডিজিটাল বাংলাদেশের বাসস্তবায়নের পর সুখী সমৃদ্ধ ও উন্নত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষি অন্তপ্রাণ ও কৃষিবান্ধব।

কৃষিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। এসব প্রযুক্তিগত সুফল সম্প্রতি কৃষিতে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। ধীরে ধীরে আরও বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে অনলাইন পরিষেবা বাড়ছে। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে প্রযুক্তির ছোঁয়া বদলে দিয়েছে কৃষকের জীবন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তথ্যপ্রযুক্তিগত সেবা ‘কৃষি বাতায়ন’ এবং ‘কৃষক বন্ধু কল সেন্টার’ চালু করেছে। বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক সেবাগুলোর জন্য কল সেন্টার হিসেবে কাজ করছে ‘কৃষক বন্ধু’ (৩৩৩১ কল সেন্টার)। ওকৃষি বাতায়ন্ত প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে কৃষকরা এখন তাদের চাষের ফসল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারছেন, বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নিতে পারছেন পরামর্শ। সরকারের বিভিন্ন কৃষি-সম্পর্কিত সেবাও পেয়ে থাকেন এই অ্যাপস ব্যবহার করে। তাছাড়াও রয়েছে ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষি বায়োস্কোপ। ফলে কৃষকরা সহজেই ঘরে বসে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ‘কৃষকের জানালা’ নামে একটি উদ্ভাবনী অ্যাপসের সহযোগিতায় ফসলের ছবি দেখেই কৃ

ষক ও কৃষি কর্মকর্তাগণ তাৎক্ষণিকভাবে শস্যের রোগ বালাই শনাক্ত করতে পারেন।

এসবের প্রভাবে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। অনেক তরুণ শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা আধুনিক কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। ফলে ডিজিটাল কৃষির বাস্তবায়নে ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণে অন্যতম একটি অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ও ক্লাউড বেইজড অটোমেটেড এগ্রিকালচারাল সিস্টেম।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) গবেষণাগারে প্রয়োগ করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার অন্যতম ভিত্তি স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম ভিত্তি স্মার্ট কৃষির বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় আইওটি ব্যবহার করে এগ্রিকালচারাল গ্রোথ মনিটরিং সম্পর্কিত নতুন উদ্ভাবন কৃষি খাতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাজ করা জটিল ও সময় সাপেক্ষ বিষয়গুলো অনেক সহজ করে দেবে। এই তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি উন্নত কৃষি পরিচর্যার পাশাপাশি অধিক উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হবে।

স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থাপনায় মাটির তথ্য যেমন: মাটির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, পিএইচ লেভেল, মাটির ইলেকট্রিক্যাল কনডাকটিভিটি, মাটির মাইক্রো ও ম্যাক্রো পুষ্টিমান (যেমন: নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি) পরিমাপ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফসলের স্বাস্থ্য নির্ণয় করা সম্ভব হবে। সেন্সরের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির তথ্য সংগ্রহ করে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে, উপযুক্ত পুষ্টি প্রদান করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব হবে। আইওটি সেন্সর এবং স্মার্ট সেন্সরবেইজড ক্যামেরা ব্যবহার করে মাটি সম্পর্কিত তথ্য ও স্মার্ট সেচ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ব্যবহার করে কৃষকরা সঠিক সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পানির প্রবাহ বা সেচ ব্যবস্থাপনা প্রথাগত ম্যানুয়াল সিস্টেম থেকে অটোমেটেড সিস্টেমে রূপান্তরিত করতে পারবে। এসব ব্যবস্থায় কৃষকরা খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে পারবে ও খামারের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে বহুগুণে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে এ দেশের কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০১ কোটি টাকা কৃষি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, কৃষকদের জন্য সুদমুক্ত ঋণের প্রবর্তন, স্বাধীনতা পরবর্তীতে ২২ লাখ কৃষকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ, ১৯৭২ সালে কৃষকদের মাঝে ধান, গম ও পাটবীজ বিতরণ, বৃক্ষ রোপণ অভিযান চালুকরণ, কৃষিতে ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহণ, সার, কীটনাশক ও সেচযন্ত্র সরবরাহ এবং গ্রামভিত্তিক সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদি।

জাতির পিতা অনুভব করেছিলেন কৃষি গবেষণা ও কৃষি প্রযুক্তির প্রসার ছাড়া কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই মহান স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই কৃষির উৎপাদনশীলতা, গবেষণা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে গতিশীলতা আনয়নের জন্য কৃষি ও কৃষির বিভিন্ন উপখাত সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পুনর্গঠন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পুনর্গঠন করেন হর্টিকালচার বোর্ড। প্রতিষ্ঠা করা হয় পাট মন্ত্রণালয় এবং ১৯৭৪ সালে অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে কৃষি গবেষণার উন্নয়ন ও সমন্বিত কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি করা হয় এবং পুনর্গঠন করা হয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে ১৯৭৩ সালে কৃষি গবেষণা সমন্বয়, গবেষণা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। পুনর্গঠন করা হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।

বাংলাদেশ আজ কৃষি উন্নয়নে বিশ্বপরিমণ্ডলে এক রোল মডেল। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি, অব্যাহত প্রণোদনা বাংলাদেশের কৃষি খাতকে নিয়ে গিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট হচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি। কৃষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়োজনের নিরিখে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, গবেষণাগার তৈরি, গবেষণার কাজে বর্ধিত অর্থ বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছেন। নতুন নতুন জাত, কলাকৌশল মাঠে ছড়িয়ে দিতে কৃষি বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে পরিশ্রম করছেন। কৃষিভিত্তিক শিল্প ও প্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশ, উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, উন্নত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের জীবননির্বাহ কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সরকারের নানামুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন উচ্চ ফলনশীল জাতের উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ, সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন, সার ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি প্রদান, সহজশর্তে কৃষিঋণ বিতরণ ইত্যাদির জন্য দেশের শস্য নিবিড়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

আগামী দিনের জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক চ্যালে মোকাবিলায় স্মার্ট কৃষি হতে হবে আরও টেকসই। এ জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্য ও বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনী জনকে একযোগে কাজে লাগানো যেতে পারে। বায়োটেকনোলজি ও ন্যানোটেকনোলজির মাধ্যমে কম আবাদযোগ্য জমিতে বেশি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভাসমান পদ্ধতিতে চাষের মতো কৃষিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি সম্বলিত ড্রোন ব্যবহার করার মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক কৃষি জমির আগাম সার্বিক অবস্থা যেমন ফসলের মাঠের আর্দ্রতা, ফসলে ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি নির্ধারণ, শস্য চারা রোপণ ডিজাইন করা, বীজ রোপণ করা, পোকার আক্রমণ জানা, কীটনাশক স্প্রে করা, ফসলের উৎপাদন জানা, ফসলের সার্বিক মনিটরিং করা, মাটির পুষ্টি, তাপমাত্রা, পিএইচ, লবনাক্ততা জানা, ফসলের রোগ ও পোকামাকড় এর উপস্থিতি জানা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং আগাম এলার্মিং, ফসলের আগাম সম্ভাব্য ফলনের পূর্বাভাস দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এ কৃষি ও কৃষিজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকে সর্বাধিক অগ্রাধিকারের জন্য অন্যতম জাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৈচিত্র্যময় কৃষিপণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদনের ওপর জোর দিয়েছে। প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদনে গবেষণা ও বাজারজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন ব্লকচেইন কিংবা ট্রেসেবিলিটির ব্যবহার রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিতকে করবে আরও মজবুত।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ প্রণীত ইশতেহারে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট কৃষি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। স্মার্ট কৃষি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান। অধিকন্তু স্বল্প সম্পদ বিনিয়োগে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে সর্বাধিক উৎপাদন করা। অল্প পানি, অল্প সার, অল্প কীটনাশক দিয়ে যদি বেশী পরিমাণ ফসল ফলানো যায় তাহলে কৃষিতে খরচ কমবে এবং উৎপাদন বাড়বে। এতে সময়ের পরিবর্তনে বর্ধিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ দেশের জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটানো সম্ভব। বাংলাদেশও গত ৫৩ বছরে ফসিল শক্তিনির্ভর কৃষি অনুসরণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কৃষিজমিতে ফসলের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ১৭টি খাদ্য

উপাদান।

এর মধ্যে তিনটি উপাদানসমৃদ্ধ ফসিল শক্তিনির্ভর কৃত্রিম রাসায়নিক সার তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়েছে বা যেসব দেশে ফসিল শক্তি দিয়ে সার উৎপাদন হয়, সেখান থেকে উচ্চমূল্যে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে আমদানি করা হচ্ছে। আবার যেহেতু এসব রাসায়নিক সারের উৎপাদন খরচ বেশি, পুঁজিবিহীন গরিব কৃষকদের পক্ষে উচ্চমূল্যে তা কিনে জমিতে প্রয়োগ সম্ভব নয়, সেজন্য জনগণের করের টাকায় ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের জন্য সার কেনা সহজ করা হয়েছে। কৃষকরাও তা ইচ্ছামতো জমিতে প্রয়োগ করে চলেছেন। কারণ প্রশিক্ষণ দিয়ে ও প্রদর্শনী স্থাপন করে শেখানো হচ্ছে, জমিতে যত বেশি রাসায়নিক সার দেয়া হবে তত বেশি ফলন।

দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান দানাদার ফসল বিশেষ করে ধানের শত শত আধুনিক জাত আবিষ্কার করে যাচ্ছে এবং এগুলো মাঠে নেয়ার সহজ উপায়ও সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতগুলো এমনভাবে প্রজনন করা হয়েছে, যাতে জমিতে যত বেশি সার বা কৃত্রিম উপকরণ প্রয়োগ করা হবে তত বেশি ফলন পাওয়া যাবে। এতে অন্য দানাদার খাদ্যে সরবরাহ করে এমন প্রজাত আর চাষই হচ্ছে না। আবার ধানের মাত্র কয়েকটি জাত চাষ হচ্ছে। ফলে দেশ একক ফসল চাষের চূড়ান্ত ধাপে অবস্থান করছে। বিজ্ঞানীরা ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের সহজ পথ আবিষ্কার করেছেন, এতে শীত মৌসুমে সেচনির্ভর ধান চাষ বেশি হচ্ছে। সবুজ বিপ্লব বাস্তবায়নে শক্তি আশ্রয়ী রাসায়নিক সার ও পানিকে সহজলভ্য করা হয়েছে। কারণ নতুন উদ্ভাবিত জাতগুলো উৎপাদনে আগের সনাতন জাতগুলোর তুলনায় যথেষ্ট বেশি পরিমাণে খাদ্যোৎপাদান ও পানির প্রয়োজন হয়, আবার মুষ্টিমেয় কয়েকটি জাত জনপ্রিয় করা হচ্ছে।

আমাদের কৃষি শুধু ফসলনির্ভর নয়। কৃষিতে স্থায়িত্বশীলতা আনতে প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসম্পদকে একত্রে বিবেচনায় আনতে হবে। দেশের বদ্বীপ পরিকল্পনা বা ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে, সে আলোকে এখনই একটি সমন্বিত নীতি প্রণয়ন করতে হবে। তার সঙ্গে একটি কম্প্রিহেন্সিভ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের এখনই সময়। যুদ্ধোত্তর দেশে বাজেটের ১৩ ভাগ রাখা হয়েছিল এখন তা নেমে শতকরা ৩ ভাগের মতো, ফলে কৃষির উৎকর্ষের জন্য কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং বর্ধিত বিনিয়োগ ব্যবহারের সক্ষমতা বাড়ানো দরকার হবে। সরকারের কৃষিনীতির অন্যতম লক্ষ্য কৃষি বাস্তুসংস্থানকে রক্ষা করা। মাটির ওপর ও নিচের জীববৈচিত্র্য বাড়ানো।

বাংলাদেশের কৃষিকে আলাদা হিসাবে দেখার সুযোগ নেই। বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখেই আমাদের চলতে হবে। আগামীর কৃষি যে যান্ত্রিক ও প্রযুক্তির কৃষি সে কথা মাথায় রেখেই সরকার কাজ করছে। আমাদের কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বড় সাফল্যটি হিসাব করা হয় জমি কর্ষণে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা পথ হাঁটলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কিংবা স্মার্ট কৃষির পথে আমাদের কোনোরকম অগ্রগতি নেই।

বাংলাদেশে কৃষি বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে রয়েছে মাঠ ফসল, সবজি, ফলমূল, ডেইরি, মাংস, মৎস্য ও পোলট্রি। এগুলো নিয়েই আমাদের কৃষি। আমাদের দেশের কৃষিতে প্রচুর মানুষ জড়িত। আগে কৃষিকাজ হতো শুধু উৎপাদনের তাগিদে। তবে ইদানীং উৎপাদনের পাশাপাশি প্রক্রিয়াকরণসহ বিভিন্নভাবে মূল্য সংযোজন করে উন্নয়নের কাজও হচ্ছে। এখন আমাদের দেশে তরুণরা কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে। যান্ত্রিকীকরণ হচ্ছে। অর্থাৎ বলা যায় আমরা কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও বাণিজ্যিক কৃষির দিকে এগোচ্ছি। আমাদের দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ গ্রামে বাস করে। যারা গ্রামে বাস করে, তাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। আবার করোনার কারণে অনেক তরুণ চাকরি হারিয়েছে। অনেকে বিদেশ থেকে ফেরত এসেছে। তারা কৃষিতে যুক্ত হয়েছে। তারাও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতে যান্ত্রিকীকরণ আরো বাড়বে।

আমাদের দেশে কৃষিতে ফুড ভ্যালু চেইনের সম্পূরক ভ্যালু চেইন নেই, যার কারণে এ অসামঞ্জস্যতা দেখা যাচ্ছে। ৫৩ বছর ধরে সরকারি-বেসরকারি খাত শুধু উৎপাদনে জোর দিয়েছে। এতে উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু উৎপাদনের পর যে প্রক্রিয়াকরণ করা প্রয়োজন, সে সক্ষমতা আমাদের দেশে নেই। প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতা সেভাবে তৈরি হয়নি। ফলে কখনো দাম বেড়ে যায় আবার কখনো তা কমে যায়। ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা করা গেলে কৃষকও ভালো দাম পাবেন এবং ভোক্তাও পণ্য কিনে সন্তুষ্ট থাকবেন।

বাংলাদেশ গত বছর ভালো রফতানি করেছে কৃষি খাতে। আমাদের যে হারে জনসংখ্যা ও ভূমি রয়েছে, তাতে আমাদের আরো অনেক বেশি পরিমাণে রফতানি করা উচিত। সমস্যা হচ্ছে আমরা এখন যা রফতানি করছি, তা মূলত যেসব স্থানে বাঙালি রয়েছে সেখানে। এটিকে মূলধারার বাজারে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে আমরা কৃষি থেকে ব্যাপক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা খাদ্য সংকট নিয়ে পূর্বাভাস দিচ্ছে। সুতরাং আমাদের আরো মজুদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। খাদ্যপণ্য পরিবহনের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রক্রিয়াকরণে উন্নত হতে হবে। আমরা যা উৎপাদন করছি তা যদি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি বিপ্লব ও খাদ্যনিরাপত্তায় ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার

কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ও খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ন্যানো প্রযুক্তি একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় কৌশল। ন্যানো কণার ব্যবহার নাটকীয়ভাবে উদ্ভিদ পুষ্টি উন্নয়ন, সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পানি ব্যবস্থাপনা, রোগ নির্ণয়, বালাই দমন, খাদ্য মোড়কীকরণ, অজীবীয় অভিঘাত সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং নিখুঁত বা প্রিসিশন কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, নতুন ন্যানো কণা কার্যকরভাবে শস্য সংরক্ষণের জন্য বালাইনাশকের কার্যকারিতা এবং নিরাপদ ব্যবহারে উন্নয়ন ঘটাতে পারে। অনুরূপভাবে, ন্যানো সার স্লো রিলিজ বা ধীরে ধীরে উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী হওয়া ও ধীর অবক্ষয়ের মাধ্যমে কার্যকরভাবে সার ব্যবহারের দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন করতে পারে। ন্যানো কণার ব্যবহার অথবা ন্যানো বাহকের ভেতরে সারের উপাদান ব্যবহার শস্যের বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

কৃষি ক্রমেই অলাভজনক শিল্পে পরিণত হচ্ছে। ফলে বর্তমান কৃষি একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল এবং অধিকতর উপকরণ ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য সাড়া না দেয়ায় এক সংকটাপন্ন অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উচ্চ উৎপাদন খরচ এবং পরিবেশের ওপর কৃষিতে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিকের কুপ্রভাবের ফলে সবুজ বিপ্লবের উচ্চ উপকরণনির্ভর শস্য উৎপাদন প্রযুক্তিগুলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে কার্যত টেকসই হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে না। অন্যদিকে বিশ্বের জনসংখ্যা ২০৫০ সাল পর্যন্ত আট বিলিয়ন থেকে বেড়ে ৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিবর্তিত জলবায়ুতে রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাব এবং অজীবীয় অভিঘাতের কারণে ভবিষ্যৎ ফসল উৎপাদন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রয়োজনমাফিক নির্দিষ্ট আকার-আকৃতির বিশিষ্ট ন্যানো কণাগুলো তৈরির সুদক্ষ পরিচালনা ও এর ব্যবহারকে একত্রে ন্যানো প্রযুক্তি বলা হয়। ন্যানো কণা হলো ১ হতে ১০০ ন্যানো মিটার আকারের অতিসূক্ষ্ম বস্তু যা, অণু এবং পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। ন্যানো মিটার হচ্ছে, এক মিটারের এক কোটি ভাগের এক ভাগ। সেজন্য ন্যানো কণাগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। এমনকি সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়েও ন্যানো কণাগুলোকে দেখা যায় না। ন্যানো

প্রযুক্তি গবেষণায় তাই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবশ্যক।

প্রকৃতিতেও রয়েছে ন্যানো প্রযুক্তির অনেক বিস্ময়কর উদাহরণ। যেমন শুধু কাঠামোগত পার্থক্য থাকার কারণে কয়লা নরম, কাল এবং সস্তা, কিন্তু হীরক শক্ত এবং নানা বর্ণের। কয়লা ও হীরক উভয়ই কার্বন দিয়ে গঠিত। শুধু কার্বন অণু সজ্জিত হওয়ার ভিন্নতার জন্য পদার্থ দু'টির এ বিস্ময়কর পার্থক্য। প্রতিটি জীবের ডিএনএতে চারটি অণু তথা এডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং থায়মিন বৈচিত্র্যময় অনুক্রমে সজ্জিত থাকে। ডিএনএ অণু একটি ন্যানো পদার্থ। ডিএনএ অণু বৈচিত্র্যময় অণুক্রমে সজ্জিত হওয়ার ফলে প্রতিটি জীব অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। প্রাকৃতিক ন্যানো পদার্থ ডিএনএ অণুর অনুক্রমে পার্থক্য থাকায় এ পৃথিবীর ৮০০ কোটি মানুষের প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। বিশ্বে করোনা মহামারী রোগের জীবাণু ভাইরাসও একটি ন্যানো কণা।

ন্যানো প্রযুক্তিকে চলমান শিল্প বিপ্লবের সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রযুক্তি গত অর্ধ শতাব্দীব্যাপী বিশ্বে ইলেকট্রনিকস এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) বিকাশে বিশাল অবদান রেখে আসছে। নানা ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি, ডিসপ্লে প্রযুক্তি, ইমেজিং এবং অনুঘটক হিসেবে প্রাণরাসায়নিক এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বহুল ব্যবহৃত হয়। শুধু কি ইলেকট্রনিকস ও আইটি, ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি ও জীববিজ্ঞানের প্রসারে এক শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

ন্যানো মিটার স্কেল বিস্তৃত সব প্রযুক্তিকে সাধারণভাবে ন্যানো প্রযুক্তি বলা হয়। ১৯৬৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত যুক্তরাষ্ট্রের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ রিচার্ড ফিলিপস ফাইনম্যানকে ন্যানো প্রযুক্তির জনক বিবেচনা করা হয়। তিনি ১৯৫৯ সালের ২৯ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অনুষ্ঠিত আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির এক সভায় ন্যানো প্রযুক্তির ধারণা পাওয়া যায়। তারপর ন্যানো প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার যাত্রা শুরু হয়। বিজ্ঞানী কমি এরিক ড্রেক্সার 'ন্যানোটেকনোলজি' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ন্যানো প্রযুক্তিকে সংক্ষেপে ন্যানোটেক বলা হয়। এটি পদার্থকে আণবিক পর্যায়ে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার বিদ্যা।

ন্যানো প্রযুক্তিকে একবিংশ শতকের একটি সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রযুক্তি বলা হয়। কারণ এ প্রযুক্তি শিল্পে যেমন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বস্ত্র বিজ্ঞান, জ্বালানি ক্ষেত্র, ওষুধ শিল্প, জীবপ্রযুক্তি এবং কৃষি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক এবং টেকসই উন্নয়নে চমকপ্রদ অবদান রাখতে সক্ষম। আধুনিক সব ইলেকট্রনিকসের সার্কিট ন্যানো কণাগুলো দিয়ে তৈরি। শুধু ইলেকট্রনিকস শিল্পেই নয়, ক্যান্সারসহ জটিল রোগ নির্ণয় ও নিরাময়, যথ স্থানে ওষুধ প্রয়োগ এবং চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞানে ন্যানো প্রযুক্তি এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

গত শতাব্দীতে সবুজ বিপ্লবে যে প্রযুক্তিগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল, তা শতকোটি মানুষের খাদ্যের জোগান দিয়েছে। সবুজ বিপ্লব এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করেছে। তবে এ বিপ্লবে ব্যবহৃত অত্যধিক মাত্রায় রাসায়নিক (সার ও বালাইনাশক), পানি সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে। এছাড়া এটি স্পষ্ট যে, সবুজ বিপ্লবের হাতিয়ার কৃষি উপকরণগুলো অত্যধিক মাত্রায় প্রয়োগেও কৃষিতে ফলন বৃদ্ধি অতীতের তুলনায় কম হারে হচ্ছে।

জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব মানুষের খাদ্যেও জোগান নিশ্চিত করতে ২০৫০ সাল পর্যন্ত শস্য উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় ৭০-১০০ শতাংশ বাড়াতে হবে। কৃষিতে নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে চাহিদার ভিত্তিতে নতুন ও অধিকতর কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন। ন্যানো প্রযুক্তি তেমনি একটি ধারালোতম প্রযুক্তি।

কৃষি উন্নয়ন ন্যানো প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো হলো ফসলের রোগ নির্ণয়, জাতভিত্তিক পুষ্টিচাহিদা নির্ণয়, পুষ্টি আহরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি; ন্যানো সেন্সর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমির গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ এবং কৃষিতে ও কৃষি পরিবেশে ভারী ধাতুর উপস্থিতি শনাক্তকরণ ও শোধনসহ ন্যানো প্রযুক্তির সার, বালাইনাশক উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে উপকরণ দক্ষতা অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ। কৃষি গবেষণায় দেখা যায়, বর্তমানে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের ৫০ শতাংশের বেশি ও বালাইনাশকের ৯৮ শতাংশের বেশি নানাভাবে নন-টার্গেটেড জীব ও প্রতিবেশে অপচয় হয়। বর্তমানে এক কেজি চাল উৎপাদনে কয়েক হাজার লিটার পানি ব্যবহার হয়। অস্বাভাবিক হারে অদক্ষ কৃষি উপকরণের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে শুধু যে ফসল উৎপাদন খরচ ভয়ানকভাবে বাড়ছে তা নয়, সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও অব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশ ও প্রতিবেশকে ক্রমে বিপন্ন করে তুলছে।

জাতীয় কৃষি নীতিতে ন্যানো প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করায় দেশে কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণায় ন্যানো প্রযুক্তি অগ্রাধিকার পায়। উল্লেখ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যানো বায়োটেকনোলজি পড়ানো হয়। ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (আইবিজিই)-এর বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে প্রথম দিনের আলোতে রিচার্জেবল টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড ন্যানো ক্যাটালিস্ট আবিষ্কার করেছেন, যা গমের ব্লাস্ট রোগ দমনে কার্যকরী। বুয়েট ও বশেমুরকৃবির যৌথ গবেষণায় ন্যানো প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুলভাবে ব্যবহৃত সেলুলোজ দিয়ে তৈরি কাগজে জীবাণুরোধী গুণাবলি আরোপ করার কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এ উদ্ভাবন আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির বিখ্যাত জার্নাল এসিএস সাসটেইনেবল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রকাশ হয়েছে। উদ্ভাবিত ন্যানো সিলভার কণা সংযোজিত কাগজ, কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ নানারকম ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষতিকারক ছত্রাক দমনে এটি খুবই কার্যকর হতে পারে। উদ্ভাবিত জীবাণুরোধী এ কাগজ মূল্যবান পণ্য, ওষুধ, খাদ্য ও কৃষিজ পচনশীল উৎপাদন যেমন মাছ, ফলমূল এবং সবজি পরিবহন ও সংরক্ষণে ব্যবহার করা যাবে।

ন্যানো কার্বন কণা প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে আরো চাঙ্গা করা সম্ভব। এছাড়া আমাদের বিজ্ঞানীরা পাট থেকে অত্যন্ত মূল্যবান সুগার মনোমার তৈরির কৌশল আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। ন্যানো প্রযুক্তিবিষয়ক আমাদের গবেষণার ফলাফল বিশ্বখ্যাত নেচারস সায়েন্টিফিক রিপোর্টস, মাইক্রোপোরাস ও মেসোপোরাস ম্যাটেরিয়ালস, ম্যাটেরিয়াল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিকস, সাসটেইনেবল এনার্জি ফুয়েলস, জার্নাল অব ভিজুয়ালাইজড এক্সপেরিমেন্টস, জার্নাল অব ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড ন্যানো টেকনোলজি, জার্নাল অব ফিজিক্যাল

কৃষিতে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহারে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা সমাধানের জন্য গবেষণা করা প্রয়োজন। যেমন অধিকাংশ ন্যানো কণার বাণিজ্যিক উৎপাদন কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। কৃষিতে ন্যানো কণা বাণিজ্যিকীকরণের আগে এর সম্ভাব্য ক্ষতিকারক দিকগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, শর্করাভিত্তিক ন্যানো কণার ন্যানোটক্সি কার্যকারিতা নেই এবং ফলে তা সার, বালাইনাশক ও জৈব অনুঘটক ও ওষুধ ডেলিভারি প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও রিসার্চ ফেলো
ফিডব্যাক: *hiren.bnnrc@gmail.com*
ছবি: ইন্টারনেট

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও
কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

হীরেন পণ্ডিত

২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে এ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় এক কোটি ৪৯ লাখ মানুষ বিদেশে কর্মরত আছেন। যাদের ৮৮ শতাংশই কোন ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়া অর্থাৎ প্রায় এক কোটি ৩২ লাখ প্রবাসীর কাজের কোন প্রশিক্ষণ নেই। আর বাকি ১২ শতাংশ প্রবাসী কারিগরি শিক্ষা, ভাষা, কম্পিউটার ও ড্রাইভিং-এ চারটির কোন একটির ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রবাসীদের মধ্যে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ডিগ্রিধারীর সংখ্যা খুবই কম।

বিশ্বে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা সামনে আসছে। এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা মাথায় রেখেই আমাদের দক্ষ কর্মজ্ঞান সম্পন্ন লোকবল সৃষ্টি করছে সরকার। দেশের মানুষকে কারিগরি ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দক্ষ করে তুলতে হবে। যাতে তারা পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে। দক্ষ জনশক্তি আমাদের দেশের উন্নয়ন খাতে অবদান রাখতে পারবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছেন। আমাদের বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে হবে।

প্রযুক্তির নানা বিকাশ, শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির রাজত্ব গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কাঠামোয় এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এখন বিশ্বব্যাপী কারিগরি জ্ঞানের কদর খুব সহজেই চোখে পড়ে। জনশক্তি খাত থেকে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে বর্তমানে তা আরও কয়েকগুণ বাড়ানো সম্ভব।

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে প্রয়োজন শিক্ষা। এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণেই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকতে উচ্চশিক্ষাকে নতুন করে সাজানোর কথা বলা হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনপূর্বক যথাযথভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন করে সাজানো প্রয়োজন এবং তা শুরু করা হয়েছে।

বিশ্ব সভ্যতাকে নতুন মাত্রা দিচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রক্রিয়া ও সম্ভাব্যতা নিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে আমাদের দেশেও। এই আলোচনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্ব দানের উপযোগী করে গড়ে তুলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা নিরলস কাজ করছেন।

আমরা জানি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হচ্ছে ফিউশন অব ফিজিক্যাল, ডিজিটাল এবং বায়োলজিকাল স্ফেয়ার। এখানে ফিজিক্যাল হচ্ছে হিউমেন, বায়োলজিকাল হচ্ছে প্রকৃতি এবং ডিজিটাল হচ্ছে টেকনোলজি। এই তিনটিকে আলাদা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে কী হচ্ছে? সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে? এর ফলে ইন্টেলেকচুয়ালাইজেশন হচ্ছে, হিউমেন মেশিন ইন্টারফেস হচ্ছে এবং রিয়েলটি এবং ভার্চুয়ালিটি এক হয়ে যাচ্ছে। আমাদেরকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে হলে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, ফিজিক্যাল ইন্টেলিজেন্স, সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স, কনটেক্সট ইন্টেলিজেন্সর মতো বিষয়গুলো মাথায় প্রবেশ করাতে হবে।

বাংলাদেশ ক্রমাগত বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম চারটি রফতানি, আমদানি, বিনিয়োগ ও সাময়িক অভিবাসন। বাংলাদেশের আমদানির পরিমাণ রফতানির চেয়ে অনেক বেশি। তাই দেশে বিনিয়োগ (বিদেশী) বৃদ্ধি ও জনশক্তি রফতানি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার প্রধান উপায়। বিদেশী বিনিয়োগ দেশে বাড়বে তখনই, যখন দেশে থাকবে পর্যাপ্ত উপকরণ, যেমন খনি বা জমি, পুঁজি কিংবা জনশক্তি। অদক্ষ জনশক্তি বিদেশী বিনিয়োগ ততটা উৎসাহিত করে না। এক্ষেত্রে শুধু শ্রমনির্ভর খাতে বিনিয়োগ হবে। বাংলাদেশ কেবল একটি পণ্যই রফতানি করছে। অথচ যেসব দেশে শ্রমিকের দক্ষতা বেশি, সেসব দেশে বাড়ে বিদেশী বিনিয়োগ। জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রেও একই চিত্র। বিদেশে শ্রমিক প্রয়োজন। তবে ক্রমাগত দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে। অদক্ষ শ্রমিকের চেয়ে দক্ষ শ্রমিক প্রায় ১০ গুণ বেশি আয় করেন। আর শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে শিক্ষার মানের ওপর। তাই শিক্ষার মান পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। গতানুগতিক চিন্তার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না।

তাহলে ভবিষ্যতে আমরা সবাইকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে পারব। তবে ভবিষ্যতে কী কী কাজ তৈরি হবে সেটা অজানা। এই অজানা ভবিষ্যতের জন্য প্রজন্মকে তৈরি করতে আমরা আমাদের কয়েকটা বিষয়ে কাজ পারি। সভ্যতা পরিবর্তনের শক্তিশালী উপাদান হলো তথ্য। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে উদগ্রীব ছিল।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিগত আলোড়ন সর্বত্র বিরাজমান। এ বিপ্লব চিন্তার জগতে, পণ্য উৎপাদনে ও সেবা প্রদানে বিশাল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। মানুষের জীবনধারা ও পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি ব্যাপকভাবে বদলে দিচ্ছে। জৈবিক, পার্থিব ও ডিজিটাল জগতের মধ্যেকার পার্থক্যের দেয়ালে চির ধরিয়েছে।

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিক্স, ইন্টারনেট অব থিংস, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, থ্রিডি প্রিন্টিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও অন্যান্য প্রযুক্তি মিলেই এ বিপ্লব। এ বিপ্লবের ব্যাপকতা, প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকতা ও এ সংশ্লিষ্ট জটিল ব্যবস্থা বিশ্বের সরকারগুলোর সক্ষমতাকে বড় ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীনও করেছে।

বিশেষত যখন সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তথা এসডিজির আলোকে 'কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে' সবাইকে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন, বৈষম্য হ্রাস, নিরাপদ কর্ম এবং দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন এসডিজি বাস্তবায়ন ও অর্জনের মূল চ্যালেঞ্জ। শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি ও অনলাইন প্রযুক্তিগত ডিজিটাল জ্ঞান তৈরি করছে নানা কর্মসংস্থান। শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো সহজ করে তুলতে এটুআইয়ের সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে 'কিশোর বাতায়ন' ও 'শিক্ষক বাতায়ন'-এর মতো প্ল্যাটফর্ম।

দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে প্রযুক্তি যেমন করে সহজলভ্য হয়েছে, তেমনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছের প্রযুক্তিনির্ভর সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সব নাগরিক সেবা ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে এক বিশ্বস্ত মাধ্যম। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মোকাবেলায় বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দিয়েছে। বাংলাদেশ আগামী পাঁচ বছরে জাতিসংঘের ই-গভর্ন্যান্স উন্নয়ন সূচকে সেরা ৫০টি দেশের তালিকায় থাকার চেষ্টা করছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ৫টি উদ্যোগ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সেগুলো হলো ডিজিটাল সেন্টার, সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড, অ্যাম্পেথি ট্রেনিং, টিসিভি (টাইম, কস্ট ও ভিজিট) ও এসডিজি ট্রেকার। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তরুণরা গড়ে তুলছে ছোট-বড় আইটি ফার্ম, ই-কমার্স সাইট, অ্যাপভিত্তিক সেবাসহ নানা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটসহ কয়েকটি বড় প্রাপ্তি বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়।

ডাটা প্রটেকশন আইনটি পাস হলে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারসহ বিদেশি কর্তৃপক্ষগুলো এ দেশে অফিস করতে এবং দেশের তথ্য দেশের

ডাটা সেন্টারে রাখতে বাধ্য হবে। মানুষের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নেতৃত্ব দানের উপযোগী করে গড়ে তুলে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে কাজ চলছে। মানুষের তথ্য প্রসারের তীব্র বাসনাকে গতিময়তা দেয় টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, টেলিভিশন এসবের আবিষ্কার। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে কম্পিউটার ও পরবর্তীতে তারবিহীন নানা প্রযুক্তি তথ্য সংরক্ষণ ও বিস্তারে বিপ্লবের সূচনা করে। আজকের এই ডটকমের যুগে আক্ষরিক অর্থেই সারা বিশ্ব একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ' এ পরিণত হয়েছে।

রিস্কিলিং, আপস্কিলিং ও ডিস্কিলিং পদ্ধতির বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। বিদ্যমান শিখন কার্যক্রমের সঙ্গে ডিজিটালনির্ভর অন্যান্য ব্যবস্থা, যেমন ই-লার্নিং ও অনলাইন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশ জনশক্তি রফতানিতে এখনো যেমন অদক্ষ ক্যাটাগরিতে রয়েছে, তেমনি দেশে দক্ষ জনবলের অভাবে বিদেশ থেকে লোক আনতে হচ্ছে। এজন্য জার্মানি, জাপান, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কারিগরি শিক্ষার মডেল আমাদের অনুসরণ করতে হবে। জার্মানিতে কারিগরি শিক্ষার হার ৭৩ শতাংশ। দেশে এ শিক্ষার হার অন্তত ৬০ শতাংশে উন্নীত করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন ও উত্তর কোরিয়ার মতো দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে কারিগরি শিক্ষা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার স্কুলের পাঠ্যসূচিতে কোডিং শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় স্কুলে কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামোয় বিনিয়োগ বেড়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে গ্রামীণ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো আমাদের শিশু ও তরুণদের তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের উপযোগীই করতে পারেনি। শিক্ষার অংশগ্রহণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের হার বেড়েছে কিন্তু মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

প্রোগ্রামিংসহ বিভিন্ন প্রাথমিক দক্ষতা সবার মধ্যে থাকা এখন ভীষণ জরুরি। কেবল পরিকল্পনা করলেই তো হবে না, অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের মানবসম্পদকেও যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে হবে এ পরিবর্তনের জন্য। তবে আশার কথা 'ন্যাশনাল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু গোড়ার সমস্যার সমাধান না করে এসব পরিকল্পনায় তেমন সুফল মিলবে না।

বাংলাদেশে উদ্ভাবনী জ্ঞান, উচ্চদক্ষতা, গভীর চিন্তাভাবনা ও সমস্যা সমাধান করার মতো দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হয়নি। তাই সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলোয় প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশ থেকে বাধ্য হয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষতাসম্পন্ন পরামর্শক নিয়োগ দিতে হচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এ খরচ বাবদ ৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পরিমাণ অর্থ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা যে কার্যকরী নয়, তা সাম্প্রতিক সময়ের এই পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও সফলতা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে শিল্প ও সেবাচালিত অর্থনীতিতে পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যদিকে সবচেয়ে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে প্রযুক্তি খাতে।

জাপান সব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেছে তার জনসংখ্যাকে সুদক্ষ জনশক্তিকে রূপান্তর করার মাধ্যমে। জাপানের এই উদাহরণ আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

বাংলাদেশের সুবিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারলে আমাদের পক্ষেও উন্নত অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়।

আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হতে পারে জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে আজকের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপান পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে শুধু মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক এবং সার্বিক জীবনমানের উত্তরণ ঘটানো যায়। জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত নগণ্য এবং আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ মাত্র ১৫%।

শিল্প-কারখানায় কী ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা লাগবে সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষাক্রমের তেমন সমন্বয় নেই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজাতে হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, ব্লকচেইন এসব প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে। এসব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পণ্য সরবরাহ, চিকিৎসা, শিল্প-কারখানা, ব্যাংকিং, কৃষি, শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করার পরিধি এখনও তাই ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত।

শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে তিনটি বিষয়ে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। এগুলো হলো- অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী বাহিনী তৈরি করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ব্যাপকহারে সরকারী বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ। তাই সবাই মিলে আমাদের এখন থেকেই একটি সুপরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব, গড়তে পারব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

তাই আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও হাইটেক পার্কসহ সবাইকে এক হয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিষয়টি মনেপ্রাণে অনুধাবনপূর্বক কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারকে এ খাতে উন্নয়ন বাজেট বাড়াতে হবে। তা না হলে আমরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বো এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখে পড়তে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে এনে দিয়েছে নতুন মাত্রা। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ফলে অর্থনৈতিক লেনদেনের সুবিধা সাধারণ মানুষের জীবনকে সহজ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিস্তৃতি লাভ করেছে। নারীরাও তথ্যপ্রযুক্তিতে যুক্ত হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নারী উদ্যোক্তাদের উপস্থিতি

বাড়ছে। দেশে প্রায় ২০ হাজার ফেসবুক পেজে কেনাকাটা চলছে। দক্ষভাবেই চলছে কাজগুলো।

স্মার্ট বাংলাদেশ হবে একটি ইনোভেটিভ বাংলাদেশ

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আর একটি সময়োপযোগী পরিকল্পনা হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্প। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্পের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই বছরের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন, ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের, যার মূল স্তম্ভ হবে চারটি- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সমাজ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশবান্ধব পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল গ্রহণে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ : আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১' তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন, ন্যানোটেকনোলজি, থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের মতো আধুনিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, পরিবহন, পরিবেশ, অর্থনীতি, গভর্ন্যান্সসহ বিভিন্ন খাত অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ রূপকল্পের কর্মপরিকল্পনায় স্থান পাচ্ছে তারুণ্যের মেধা, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার বিকাশ এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবনী জাতি গঠন। চারটি মূল ভিত্তির ওপর নির্ভর করে ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা সর্বত্র প্রযুক্তিনির্ভর। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে সরকার ইতোমধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে অন্যতম সিদ্ধান্ত হলো- ডিজিটাল ইনক্লুশন ফর ভালনারেবল এক্সেপেশন (ডাইভ)-এর আওতায় আত্মকর্মসংস্থান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ; 'ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ, ওয়ান ড্রিম'-এর আওতায় শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম নিশ্চিত করা; স্মার্ট সরকার গড়ে তুলতে ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি স্থাপন। রোবটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ যুগে আমাদের সামনে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের হাতছানি ইত্যাদি সব মিলিয়ে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যস্ত এখন বিশ্বের প্রতিটি দেশ। প্রত্যেকেই খুঁজছে প্রযুক্তির সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের সহজ ও টেকসই উপায়। এক্ষেত্রে অনেক দেশ বেশ এগিয়ে রয়েছে নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিকে বরণ করে। এসব পরিবর্তনের সঙ্গে যারা তাল মেলাতে পারবে না, তারা পিছিয়ে যাবে এমনটাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। টিকে থাকার জন্য অনেক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করছে। অনেক দেশ আইসিটি খাতের দ্রুত উন্নয়ন করে তরুণদের দক্ষ করে গড়ে তুলছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে নারী সমাজকে। প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে অনেক দেশ ইতোমধ্যেই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব জয় করে পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার কিছুটা উন্নতি হলেও উচ্চশিক্ষায় তাদের

অগ্রগতি এখনো অনেক কম। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ প্রায় শতভাগ ৯৮ শতাংশ, মাধ্যমিকে ৭০ শতাংশ এবং দুই স্তরেই নারী-পুরুষের সংখ্যা কাছাকাছি হলেও উচ্চশিক্ষায় নারীরা অনেক পিছিয়ে। বিবিএসের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে সাক্ষরতার হারে নারীদের চেয়ে এগিয়ে আছেন দেশের পুরুষরা। বর্তমানে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৭৬.৫৬ শতাংশ হলেও নারীদের সাক্ষরতা ৭২.৮২ শতাংশ। বিগত বেশ কয়েক বছরে কারিগরি শিক্ষায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে, তবে এখনো যথেষ্ট নয়। কারিগরি শিক্ষায় নারীদের অবস্থান আরও পেছনে। জাতিসংঘের হিসাব বলছে, ২০২১-এ আমাদের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ 'ওয়ার্কিং এইজ পপুলেশন' (১৮-৬৪) তথা শ্রমবাজারে নিয়োজিত হওয়ার উপযোগী বয়সের মানুষ। তাদের প্রক্ষেপণ বলছে, ২০৩০ নাগাদ এ অনুপাত আরও ২ পয়েন্ট বেড়ে ৫৭ শতাংশ হতে পারে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবকে মোকাবিলা করে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী জনবল তৈরির চ্যালেঞ্জে জয়ী হওয়ার জন্য স্টেম এডুকেশন সহায়ক হতে পারে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন। স্টেম এডুকেশন হলো এমন একটি শিখন পদ্ধতি, যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতকে আলাদা আলাদা বিষয় হিসাবে না শিখিয়ে বরং এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যেন শিক্ষার্থীরা এ চারটি বিষয় মিলিয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সেটা তাদের কাছে অত্যধিক জীবনমুখী হয়। কেবলমাত্র জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজ বা রাষ্ট্রের অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা জীবনে প্রতি মুহূর্তে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হই, তার কোনোটিই কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

ফলে এগুলো সমাধানে দরকার হয় বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বিত জ্ঞান। জ্ঞানের আসলে কোনো বিভাজন নেই। পৃথিবীতে জ্ঞানের সংখ্যা যখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তখন এগুলোকে কাজের ও ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে নামকরণ হয়েছে শুধু রপ্ত করা বা মনে রাখার সুবিধার জন্য। এখনো জ্ঞানকে আয়ত্ত করার সুবিধার্থে বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় বিভক্ত করা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাগুলো ইচ্ছামতো শাখা-উপশাখায় বিভক্ত করা যায় না। সেজন্য দক্ষতার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করতে অনেক সময় আমরা হিমশিম খাই। এসব বিবেচনায় বর্তমানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতকে সমন্বিত করে শেখানোর কথা বেশ আলোচিত।

ব্যবসায় শিক্ষায় সবগুলো বিষয়কে সমন্বয় করে বিবিএ নামে শেখানো হচ্ছে, যা ইতোমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। আইবিএ নামক

ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। আইনের ক্ষেত্রে সমন্বিত শিক্ষা চলছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমন্বিত শিক্ষা চলছে। ভবিষ্যতে হয়তো এরকম আরও গুচ্ছ তৈরি হতে পারে বাস্তবতার প্রয়োজনে।

আমাদের কারিগরি শিক্ষা এবং প্রযুক্তি শিক্ষা অনেকটাই স্টেম শিক্ষার আদলে হলেও আন্তর্জাতিক মান থেকে এখনো অনেক দূরে। এজন্য আরও নিচের লেভেল থেকে স্টেম শিক্ষাকে বিবেচনায় নিলে প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী জনবল তৈরিতে এগিয়ে থাকা সম্ভব। স্টেম শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই মুখস্থ করার সনাতনী নিয়মকে কমিয়ে আনতে ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও জীবনমুখী করতে ভূমিকা রাখে। তাদেও যোগাযোগ দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসকে শাণিত করে। স্টেম শিক্ষা তাদের আবেগের পাশাপাশি চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে এবং কর্মমুখী করে। সহযোগিতামূলক মনোভাবকে উৎসাহিত করে, কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। স্টেম শিক্ষা শিক্ষার্থীদের আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়।

বাংলাদেশ স্টেম শিক্ষা ফাউন্ডেশন ২০২০ সালে সারা দেশে এক গবেষণামূলক কনসেপ্ট পেপার ও প্রজেক্ট আহ্বান করে এবং সেখানে শতাধিক টিমের ২৩৮টি প্রজেক্ট জমা পড়ে এবং এর মধ্যে জয়ী হয় বুয়েট টিম, ১ম রানার আপও হয় বুয়েট টিম, দ্বিতীয় রানারআপ হয় চুয়েট টিম। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তারা সফলতার স্বাক্ষর রাখছে। এবার রোবোটিক্সে অলিম্পিয়াড বলে খ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা বিদেশি নামকরা অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হারিয়ে সফল হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এভাবে বাংলাদেশে স্টেম এডুকেশন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পৃষ্ঠপোষকতা পেলে স্টেম শিক্ষায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রযুক্তির এ অবাধ সুযোগে আমরা এখনো অদক্ষ প্রবাসী শ্রমিক এবং গার্মেন্টস রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি আঁকড়ে ধরে আছি। মানুষের ইন্টারনেট অ্যাকসেস এখনো ৪০ শতাংশ অতিক্রম করেনি। অথচ এর মধ্যেই প্রায় ৮-১০ লাখ তরুণ উদ্যোক্তা নিজে নিজেই প্রযুক্তি রপ্ত করে ফ্রিল্যান্সিং কাজে যুক্ত হতে পেরেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্টেম শিক্ষায় যারা শিক্ষিত, তাদের জন্য প্রতি বছর ১৭ শতাংশ হারে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে অন্য ডিগ্রিধারীদের জন্য এ সুযোগ ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। টারশিয়ারি পর্যায়ে স্টেম বিষয়ে পড়ালেখা করছে এমন শিক্ষার্থীদের অনুপাত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ১১ শতাংশ, যা প্রতিবেশী ভারতে ৩৪ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ায় ৪৪ শতাংশ।

বাংলাদেশে সরকারিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রযুক্তিবিষয়ক নতুন নতুন বিষয় খোলা হচ্ছে। এছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বাড়ছে। তবে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানোর জন্য ব্যাপক হারে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমেই সুফল পাওয়া সম্ভব। যেমন কারিগরি শিক্ষায় সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশ জার্মানি সফল হয়েছে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ডুয়েল পদ্ধতি ব্যবহার করে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুলে অধ্যয়নকালে উচ্চ বেতনসহ কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। অথচ জার্মানিতে কারিগরি শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশেরও পরে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও আইসিটি ও স্টেম শিক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা যে কোনো নারীর চোখ খুলে দিতে পারে, চেঞ্জমেকার হওয়ার মতো মনোবল তৈরি করতে পারে। ইন্টারনেট এবং ই-কমার্সের যুগে গ্রামীণ নারীদের জন্যও সমান সুযোগ রয়েছে। আইসিটি সেক্টরে মেধাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে পুরুষ, মহিলা, সংখ্যালঘু, এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সবার জন্য রয়েছে কর্মসংস্থানের বৈষম্যহীন সমান সুযোগ। তাই স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট জাতি গঠনই যেখানে আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য, সেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি তৈরি করা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যন্ত সর্বস্তরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্টেম শিক্ষার চর্চা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। পাশাপাশি স্টেম শিক্ষার জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে একুশ শতকের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল গড়ে তুলে এবং অর্জিত জ্ঞান ও উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে দিতে পারলেই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম হবে।

জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ তৈরি করা ও স্মার্ট শিক্ষা

'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের সিদ্ধান্তের পর ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে বর্তমান সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বিনির্মাণের লক্ষ্যে একটি সময়োপযোগী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্মার্ট শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় ব্লেন্ডেড শিক্ষা ও দক্ষতা বিষয়ক মহাপরিকল্পনা'-এর খসড়া প্রণয়নে ব্লেন্ডেড শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স-কে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে এটুআই। এটুআই সহযোগিতায় বিচারিক ব্যবস্থাকে সহজ করতে চালু হয়েছে অনলাইন কজলিস্ট, জুডিসিয়াল মনিটরিং ড্যাশবোর্ড এবং আমার আদালত (মাইকোর্ট) অ্যাপ যা আগামী ২০৪১ সালের স্মার্ট বিচারিক ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে।

স্মার্ট ইকোনমির অংশ হিসেবে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রবাস যাত্রা সহজ করতে এবং প্রবাসে যাওয়ার প্রস্তাব সেবাসমূহ একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট থেকে প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে প্রবাসী হেল্প ডেস্ক চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এটুআই চালু করেছে 'সাথী' নামক একটি নেটওয়ার্ক।

বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতষ্ঠান বিভাগ ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহযোগিতায় এটুআই প্রাথমিক পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তা নিয়ে এই নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু করেছে। দেশের সকল পরিষেবা বিল, শিক্ষা সংক্রান্ত ফি ও অন্যান্য সকল ধরনের সরকারি সেবার ফি বা বিল প্রদানের পদ্ধতি সহজ ও সমন্বিতকরণে চালু হওয়া সমন্বিত পেমেন্ট প্ল্যাটফরম 'একপে'-তে বিভিন্ন ধরনের করতে নতুন ৮টি আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নতুন পেমেন্ট চ্যানেল যুক্তকরণ।

স্মার্ট গভর্মেন্ট এর অংশ হিসেবে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ডিজিটাল সেন্টারভিত্তিক ওয়ানস্টপ সেবা কেন্দ্র এবং প্রকল্পের কাজে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পিপিএস এবং আরএমএস সফটওয়্যার এবং স্মার্ট গভর্মেন্ট বাস্তবায়নে চালু করা হয়েছে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট (আরএমএস) সিস্টেম। কেমন হবে ২০৪১ সালের 'স্মার্ট বাংলাদেশ'? আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংসের (আইওটি), রোবটিকস, ব্লকচেইন, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রি-ডি প্রিন্টিং এর মতো আধুনিক ও নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্য, পরিবহন, পরিবেশ, শক্তি ও সম্পদ, অবকাঠামো, অর্থনীতি, বাণিজ্য, গভর্ন্যান্স, আর্থিক লেনদেন, সাপ্লাই চেইন, নিরাপত্তা, এন্টারপ্রেনারশিপ, কমিউনিটিসহ নানা খাত অধিকতর দক্ষতার দ্বারা পরিচালনা করা হবে। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রচলন। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে গড়ে তোলার প্রকল্পসহ মোট ৪০টি মেগাপ্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে এই আইসিটি মাস্টার প্ল্যানে।

এসব কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম লক্ষ্য ২০৪১ সাল নাগাদ জাতীয় অর্থনীতিতে আইসিটি খাতের অবদান অন্তত ২০ শতাংশ নিশ্চিত করা। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশ বান্ধব পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশল গ্রহণ করছেন এই আইসিটি মাস্টার প্ল্যান-২০৪১ এ । এই পরিকল্পনা ও নীতি-কৌশলে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করা হচ্ছে। প্রযুক্তিতে বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রবেশগম্যতা ও অভিযোজন, যা স্মার্ট বাংলাদেশের চার স্তম্ভের বাস্তবায়ন এগিয়ে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তুলতে ডিজিটাল লিডারশিপ অ্যাকাডেমি স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে আইসিটি ডিভিশন। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে অঙ্গীকার, তা বাস্তবায়নে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটরের মতো অবকাঠামো অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। আগামীর তরুণ প্রজন্মের মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে ভিত্তি তৈরি করে গেছেন, সে পথ ধরেই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। গত ১৬ বছরের বেশি পথচলায় প্রমাণিত হয়েছে, ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক উন্নয়ন দর্শন। এখন সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'এ রূপান্তর করা। এক্ষেত্রে, ৪র্থ শিল্প বিপবের যুগে যদি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি , তাহলে স্মার্ট সিটিজেন,

স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি এই চারটি মূল ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলা সম্ভবপর হবে মর্মে আমরা আশাবাদী।

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা

বিশ্ব অর্থনীতির পরিমণ্ডলে সংগ্রামী একটি জাতি থেকে এক উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিতে বাংলাদেশের যে রূপান্তর ঘটেছে, ঘটনাটি ম্যাজিকের থেকে কোনো অংশে কম নয়। 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলা হতো আমাদের, সেখান থেকে বিশ্ববাজারে এক উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে ওঠার পথে দেশটির যাত্রা তার সাহস এবং সংকল্পেরই প্রমাণদয়। এখন যে সময়ে আমরা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলোও মোকাবিলা করা শিখতে হবে।

এই ভিশন বাস্তবায়নের মর্মে যে শিল্প খাতটি অবস্থান করে, সেটি হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত বা আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি; যা বাংলাদেশের সমৃদ্ধিতে প্রধান একটি পরিচালিকা শক্তি হিসেবে ইতোমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। ১.৮ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানিবাজারসহ আইটি সেক্টরে ৩.৪ বিলিয়ন ডলারের একটি বাজার বিদ্যমান। প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা মূল্যমানের বার্ষিক বেতন দিয়ে প্রায় তিন লাখ ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছে বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টর। আমাদের অর্থনীতির একটি জরুরি ভিত্তি হয়ে উঠেছে শিল্প খাতটি। আমাদের জাতীয় জিডিপিতে এর প্রত্যক্ষ অবদান প্রায় ১.২৫ শতাংশ, পরোক্ষভাবে যা প্রায় ১৩ শতাংশ।

রপ্তানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কৌশলগত একটি খাত হিসেবে আইসিটি শিল্পের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। উচ্চ সিএজিআরসহ ক্রমবর্ধমান একটি খাত আইসিটি, প্রতি বছর ২০ হাজারেরও বেশি লোক নিয়োগ করে চলেছে। আইসিটি শিল্পের সাফল্য উদযাপনের পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো সফলতার সঙ্গে উতরে যেতে সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ২০২৪ সালের জুন থেকে আইটি এবং আইটি-এনাবেলড সার্ভিসের জন্য ছাড়কৃত করপোরেট করের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এই প্রণোদনা ছোট এবং মাঝারি আকারের আইসিটি কোম্পানিগুলো যেগুলো কি না এই শিল্প খাতের মেরুদণ্ড তৈরি করে, তাদের ব্যবসা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি। হাজার হাজার আইসিটিনির্ভর পেশাজীবীর জীবিকা ঝুঁকির মুখে পড়বে, একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দিকে আমাদের অগ্রযাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

আইসিটি শিল্প, ছাড়কৃত করের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে তা বাংলাদেশি শিল্প খাতের ইকোসিস্টেমে একটি নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। শিল্পটি প্রতিযোগিতামূলকভাবে পিছিয়ে না পড়ের এবং এই সেক্টরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে। এমনকি আইসিটি পেশাজীবীদের বেতন থেকে প্রাপ্য আয়করের অংশটিও কমে যাবে। সার্বিকভাবে অর্থনীতির স্বাস্থ্যকে আইসিটির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলতে পারি, বৈশ্বিক আইটির একটি প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠার পথে বাংলাদেশের যাত্রায় তা বিঘ্ন ঘটাবে।

স্মার্ট বাংলাদেশের রূপকল্প তৈরি হয়েছে এআই, আইওটি, ব্লকচেইন, রোবটিক্স, মেশিন লার্নিংয়ের মতো প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এগুলো, এসব প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার হয়। নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে যদি প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের সেই উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি না হয়, ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের ভিশন অর্জন সহজ হবে না।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) পর্যায় থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের পরবর্তী সময়ের জন্য রপ্তানি প্রণোদনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো প্রস্তাবিত হয়েছে, তা আমাদের আইসিটি রপ্তানির বৃদ্ধিকে আরও বাধাগ্রস্ত করতে পারে। উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে প্রত্যাশিত রপ্তানির ওপর নামমাত্র ২ শতাংশ প্রণোদনা দিলে আইটি রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বৈশ্বিক ক্যানভাসে আইসিটি পরিষেবার একটি গন্তব্য হয়ে ওঠা শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে আমাদের।

এই চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক পরিষদ এবং জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের একটি সাহসী এবং কৌশলগত অবস্থান নেওয়া দরকার বলে মনে করি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনের চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে আইসিটি শিল্প যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এই শিল্পক্ষেত্রের অগ্রযাত্রা বজায় রাখতে সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে হবে আমাদের। ২০২৪ সালের পরও আইসিটি সেক্টরের জন্য কর প্রণোদনা যেন চলতে থাকে, রপ্তানি প্রণোদনার নীতিগুলো যেন বৃহত্তর সুবিধার কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং এই শিল্প খাতে যত উদ্যোগ ও এসএমই গড়ে উঠেছে, সেগুলো বেড়ে ওঠার জন্য যেন একটি অনুকূল পরিবেশ পায়।

বাংলাদেশ আজ এক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির পথে আছে এবং আইসিটি শিল্প নিঃসন্দেহে এর ভবিষ্যৎ তৈরিতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে। তবে এই রূপকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং এই সেক্টরে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার স্বার্থে একটি সাহসী ও কৌশলী উপায় অবলম্বন করতে হবে আমাদের। বাংলাদেশের আইসিটি শিল্পকে পূর্ণ সম্ভাবনায় উন্মোচিত করার এখনই সময়। আশা করি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালিয়ে যাব আমরা, উৎসাহিত করব উদ্ভাবনী শক্তিকে এবং বাংলাদেশিদের জন্য এক উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত হবে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও রিসার্চ ফেলো
ফিডব্যাক: *hiren.bnnrc@gmail.com*
ছবি: ইন্টারনেট

আধুনিক প্রযুক্তির আবাসন শহর
স্মার্ট সিটি

জাতিসংঘ প্রত্যাশা করছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শহরে বসবাস করবে। ২০১৫ সালে বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিএসএস) এজেন্ডা বিষয়ে একমত হয়, যা জাতিসংঘ দ্বারা স্বীকৃত। যার মধ্যে ১১ নম্বর গোল বা লক্ষ্য ছিল, সাসটেইনেবল সিটিস এবং কমিউনিটিস। এতে শহর এলাকাকে প্রযুক্তি নির্ভর সুন্দর একটি শহরে পরিণত করা উচিত, যা ছাড়া এই এসডিএসএস লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। আর 'স্মার্ট সিটি'র প্রয়োজনীয়তা সেখানে, যেখানে মানুষ পাবে প্রযুক্তি নির্ভর একটি বাসযোগ্য শহর। যেই শহরে ইলেকট্রনিক ডাটা সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষ এবং অবকাঠামোর মধ্যে একটি সময় উপযোগী মেলবন্ধন গড়ে তুলে শহরের মানুষকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দিবে।

নাজমূল হাসান মজুমদার

স্মার্ট সিটির ধারণা ও আবির্ভাব

৬ হাজার বছর পূর্বে শহরগুলিতে যখন মানুষের বসবাস করা শুরু হয়, তখন সন্ত্রাস, ট্যাক্স সংগ্রহ, পয়ঃনিষ্কাশন, পাবলিক সুবিধা নিয়ন্ত্রণ এবং এনার্জি বা শক্তির পরিষেবাগুলি সমস্যা উঠে আসে এখনকার বর্তমান সময়ের মতন। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ দশকের সময়ে স্মার্ট সিটির ধারণা সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ডাটা সংগ্রহ, রিপোর্ট ইস্যু, এবং সরাসরি রিসোর্স কাজে লাগিয়ে স্মার্ট সিটি গড়ে উঠছে। এরপর থেকে তিনটি ভিন্ন প্রজন্ম'র স্মার্ট সিটির আবির্ভাব হয়েছে। তার মধ্যে স্মার্ট সিটি ১.০ মূলত টেকনোলজি প্রোভাইডারদের নেতৃত্বে অগ্রযাত্রা শুরু করে। এই প্রজন্মের সিটি প্রযুক্তির বাস্তাবায়নে গুরুত্ব পায়, মহানগরের সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এটি আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে প্রভাব ফেলে। স্মার্ট সিটি ২.০ শহরগুলোর নেতৃত্বে ছিল, এই দ্বিতীয় প্রজন্ম, পৌরসভার মধ্যে অগ্রগামী চিন্তাশীল নেতারা শহরের ভবিষ্যৎ তৈরি করতে কিভাবে স্মার্ট প্রযুক্তি এবং অন্যান্য উদ্ভাবন স্থাপন করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করেছিল। তৃতীয় প্রজন্মের স্মার্ট সিটি ৩.০ প্রযুক্তি প্রদানকারী বা নেতারা নিয়ন্ত্রণ নেয়না, পরিবর্তে, একটি নাগরিক সৃষ্ট মডেল গ্রহণ করা হয়। এই অতি সাম্প্রতিক অভিযোজনটি ইক্যুইটির সমস্যা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিসহ একটি স্মার্ট কমিউনিটি তৈরি করার ইচ্ছা অনুপ্রাণিত বলে মনে হচ্ছে। অস্ট্রিয়া'র ভিয়েনা প্রথম দিককার একটি শহর যেটা তৃতীয় প্রজন্মের মডেল অনুসরণ করেছে। লোকাল এনার্জি কোম্পানি 'উইন এনার্জি'র সাথে একটি পার্টনারশিপ করেছে ভিয়েনা। নাগরিকরা লোকাল সোলার প্ল্যান্ট'র ইনভেস্টর, এবং এনগেজ হয়েছে বিভিন্ন ইস্যুতে।

স্মার্ট সিটি কি

একটি ইন্টিলিজেন্ট শহর হচ্ছে স্মার্ট সিটি, যা প্রযুক্তির কল্যাণে সাসটেইনেবল আরবান ডেভেলপমেন্ট'র ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যাচ্ছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছেঃ শক্তি কাজে লাগান, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং শহরের নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়ন ঘটানো। এই ধারণা বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যেমনঃ ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি, ট্রান্সপোর্ট, পরিবেশ, এনার্জি, সাপ্লাই, স্বাস্থ্য, সিকুয়েরিটি প্রভৃতি যা ভালো পরিষেবা সরবরাহ করে। আইওটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, বিগ ডাটা প্রভৃতি প্রযুক্তি সিস্টেম একীভূত অবস্থা সংযোগ তৈরি করে। ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং প্রতিষ্ঠান ম্যাককিনসে'র মতে, স্মার্ট সিটিগুলি ডাটা বা তথ্য সংগ্রহ করে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাজ করে, যা জীবনের মান উন্নয়ন করে। মূলত রিয়েল টাইম ডাটা সরবরাহ করে এজেন্সিগুলিকে বুঝতে সাহায্য করে কি ঘটছে এবং সে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে দ্রুত সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সলিউশন আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী করে।

'ম্যাককিনসে' তিন স্তরকে প্রাধান্য দিয়েছে স্মার্ট সিটি তৈরির ক্ষেত্রে। যার প্রথমটি টেকনোলজি বা প্রযুক্তি যাতে স্মার্টফোন, সেন্সর, আরএফআইডি ট্যাগ এবং স্মার্ট মিটার অন্তর্ভুক্ত থাকে যা উচ্চগতি সম্পন্ন কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, অ্যাপ্লিকেশন যা ডাটা ব্যবহার করে কাজ করে। এটি ডাটা সংগ্রহ করে সেটাকে ভ্যালুয়েবল অ্যাসেটে পরিণত করে ব্যবসা ও কাস্টমারের জন্যে। আর এইক্ষেত্রে টেকনোলজি প্রোভাইডার এবং অ্যাপ ডেভেলপারের দরকার পরে। অপরটি হল, সিটিজেন ও ব্যবসা যা চূড়ান্ত স্তর হিসেবে পরিগণিত ব্যবহারকারী সকলের কাছে। অ্যাপ্লিকেশনের সফলতার জন্যে বিহেভিয়ার পরিবর্তন ও তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। অ্যাপ মানুষকে বিভিন্ন পথ বাছাই করতে উৎসাহিত করে, স্বল্প শক্তি ব্যবহারে অথবা পানি অথবা, স্বাস্থ্যখাতে সমস্যা স্বল্প করে। ইউনাইটেড ন্যাশনস ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ (ইউএনইসিই)'র মতে, স্মার্ট সিটি হলো বিস্তৃত পরিসরে হোম কানেক্টিভিটি এবং পাবলিক স্পেসে ওয়াইফাই, ইন্টিলিজেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্মার্ট ইলেকট্রিসিটি মিটার, ওপেন ডাটা, এবং ই-গভর্নমেন্ট।

স্মার্ট সিটির ফিচার

৫০ বছরের অধিক সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সস ভিত্তিক রিসার্চ এবং কনসালটেন্টসি 'ফ্রস্ট এন্ড সাল্লিভান' প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। 'ফ্রস্ট এন্ড সাল্লিভান' মতে, ২০২৫ সাল নাগাদ স্মার্ট সিটি'র মার্কেট আকার ১.৫৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পরিণত হয়ে বিশাল ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করবে। উত্তর আমেরিকা স্মার্ট হেলথকেয়ার সেক্টরের ৫০ ভাগের বেশি মার্কেট নেতৃত্ব দিবে ২০২৫ সালে, এর পরেই থাকবে ইউরোপ। স্মার্ট প্রযুক্তিতে ১৮.২৩ ভাগ বৃদ্ধি হবে উত্তর আমেরিকার এবং ইউরোপে। আর স্মার্ট এনার্জিতে উত্তর আমেরিকাতে সর্বোচ্চ ২৮.৭ ভাগ বৃদ্ধি ২০২৫ সালে হবে। একই বছরে প্রায় ৪২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে লাতিন আমেরিকা, মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকার মতন মহাদেশগুলোতে। আর অপরদিকে, চীন এবং ভারতে ২০৩০ সালে স্মার্ট বিল্ডিংয়ে ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যবসায়িক পরিধি হবে, এরপরেই জাপান ও কোরিয়ার অবস্থান থাকবে। 'ফ্রস্ট এন্ড সাল্লিভান' স্মার্ট সিটির বৈশিষ্ট্য বা ফিচার বুঝাতে নিম্নোক্ত ৮ টি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে, যার মধ্যে একটি সিটিকে নূন্যতম এর পাঁচটি বিষয় উপস্থিতি থাকা আবশ্যক।

স্মার্ট গভর্নেন্স

স্মার্ট সিটি বা শহরগুলির সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে এবং স্মার্ট গভর্নেন্স'র পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলো ই-গভর্নমেন্ট টুলস এবং উদ্যোগগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণকে উন্নত করেছে। নাগরিকদের যোগাযোগ মোবাইল স্মার্টফোন এবং অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত হয়েছে, সেইসাথে অন্যান্য ডিজিটাল পরিষেবাগুলি অনেক বেশি যোগাযোগের কাঠামোকে সহজতর করেছে। ই-শিক্ষা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমাধানগুলিও স্মার্ট গভর্নেন্সের অংশ, এবং নাগরিকরা তাদের শহর শাসনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। ই-গভর্নমেন্ট টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে পরিষেবাগুলিকে আরও সহজলভ্য করার পাশাপাশি এটি সরকারি পরিষেবাগুলিকে আরও সাশ্রয়ী, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ করে তোলে।

স্মার্ট এনার্জি

স্মার্ট শক্তি শহরগুলিতে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত এবং এতে স্মার্ট গ্রিড, স্মার্ট মিটার এবং বুদ্ধিমান শক্তি সঞ্চয়স্থানের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাধারণত এর মানে হলো স্মার্ট সিটি কিংবা শহরগুলিতে আর প্রচলিত উপায়ে চালিত হয়না। স্বাভাবিকভাবেই, স্মার্ট শহরগুলি বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং তারা যে সুবিধাগুলি নিয়ে আসে তা গ্রহণ করতে শুরু করেছে এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের চাহিদা বাড়াতে সাহায্য করার জন্য অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। স্মার্ট এনার্জি অবকাঠামো অনেক বেশি দক্ষ ও নতুন সম্ভাবনা রয়েছে এবং একটি সবুজ, পরিষ্কার পরিষ্কার পরিবেশের দিকে নিয়ে যায়। স্মার্ট এনার্জি সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামো চালানোর জন্য ব্যাপক খরচ সাশ্রয় করে। স্মার্ট এনার্জি অ্যাপ্লিকেশনগুলি শহরগুলিকে তাদের শক্তির চাহিদা প্রোফাইল বুঝতে দেয়। কর্মকর্তারা লোড, এবং প্রাত্যাহিক ওঠানামা এবং স্বল্প খরচকে অগ্রাধিকার দেয়। দূষণ হচ্ছে দ্রুত নগরায়নের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক দিকগুলির মধ্যে একটি এবং স্মার্ট এনার্জি হলো স্মার্ট শহরগুলির কার্বন পদচিহ্ন কমাতে এবং তাদের শক্তি খরচকে ডিকার্বনাইজ করার সেরা উপায়গুলির মধ্যে একটি। ২০২৬ সাল নাগাদ ৭৩ মিলিয়ন কানেক্টেড রাস্তার লাইট বিশ্বজুড়ে সন্নিবেশিত করা হবে। স্মার্ট সিটি ছাদের মাধ্যমে সোলার সিস্টেম চালু করছে শক্তির উৎপন্নের জন্যে।

স্মার্ট বিল্ডিং

স্বয়ংক্রিয় এবং বুদ্ধিমান বিল্ডিং বলতে পারেন, যা নবায়নযোগ্য শক্তি একীভূতভাবে অন্তর্ভুক্ত। স্মার্ট বিল্ডিংগুলো সর্বাধিক উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা কাজে লাগাতে ডিজাইন করা হয়েছে, এতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং বিল্ডিংয়ে মানুষদের ভালো কর্ম পরিবেশে কাজ করার অবস্থা প্রদান করে। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ স্মার্ট বিল্ডিং এর পূর্বশর্ত,

বিল্ডিংগুলিতে প্রবেশে বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে পরিচালনা করার সুবিধার্থে এই কাজ। আজকাল আপনার নিজস্ব ডিভাইস পরিবেশ এবং যোগাযোগ আনতে সহায়তা করে স্মার্ট বিল্ডিং। আইওটি প্রযুক্তি স্মার্ট বিল্ডিং এর কেন্দ্রবিন্দুতে এবং সামগ্রিক সংযোগ উন্নত করতে, পাশাপাশি স্মার্ট লাইটিং ও হিটিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে শক্তি দিতে সহায়তা করে।

স্মার্ট মোবিলিটি

স্মার্ট সিটিজুড়ে মানুষ যেই স্মার্ট ট্রান্সপোর্ট করে থাকে সেটা স্মার্ট মোবিলিটি। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বজুড়ে স্মার্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম সলিউশন বহুল ব্যবহৃত, যেমনঃ রাইড শেয়ারিং এবং কার শেয়ারিং এর মতন বাস ট্রেইন এবং বাইক সকল কিছু। ভবিষ্যতের সময়ে স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের ওপর এর নির্ভরতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। ইলেকট্রিক কার, এবং বাস, ই-বাইক, রাইড শেয়ারিং এর মতন আরও কিছু। ইতিমধ্যে অনেক শহর এই সুবিধাগুলি নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে সেটা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। স্বয়ংক্রিয় যানবাহন শক্তিশালী স্মার্ট পরিবহন নেটওয়ার্ক প্রয়োজনীয়তাকে চালিত করবে। একীভূত ভ্রমণ বুকিং এবং পেমেন্ট সিস্টেম নাগরিকদের ভ্রমণ কাঠামো সমন্বিত রুপ প্রদান করছে। স্মার্ট পরিবহনের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমান ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, স্মার্ট পার্কিং এবং সমন্বিত মোডাল পরিবহন, যা সবই শহুরে গতিশীলতা উন্নত করতে সহায়তা করে। নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম শহরে স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যথারীতি চালু রয়েছে, যা শহরকে রাস্তায় ভ্রমণের সময় সেই মুহূর্তের তথ্য সম্প্রচার করে যাত্রীদের কোন রাস্তায় যেতে হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সিটি ভিত্তিক মেসেজিং সিস্টেম, তৈরি করেছে। স্পেনের বার্সেলোনা শহর ট্রান্সপোর্ট প্রযুক্তি দ্বারা একীভূত, যা ট্রাফিক প্যাটার্নের তথ্য বা ডাটা গ্রহণ করে শহরটির বাস নেটওয়ার্ক'তে সহায়তা করে। ইন্টিলিজেন্ট ভেহিকেল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এর 'এলপ্র্যাট এয়ারপোর্ট'তে। স্মার্ট ভেহিকেল কোম্পানি 'সেনসেফিল্ড' ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে দ্রুত সময়ে সেই এয়ারপোর্টের ডিপার্টচার এলাকায় এবং যানবাহনের সংখ্যা গণনা করে। সেন্সর এমবেডেড থাকে ফ্লোরের সাথে, যাতে পার্কিং স্পেস খালি আছে কিনা নেই সেটা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। এই আইওটি সেন্সর ডাটা বা তথ্য প্রেরণ করে ক্লাউড নির্ভর স্মার্ট পার্কিং প্ল্যাটফর্মে, যা শহরের রিয়েল টাইম পার্কিং ম্যাপের সাথে একীভূতভাবে কাজ করে।

স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার

একটি শহরের ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট কাঠামো স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যা আইওটি সেন্সর এবং ডিজিটাল ওয়াটার ও ময়লা ম্যানেজমেন্ট'কে একই সাথে একীভূত করে। স্মার্ট বিল্ডিং এর একটি অংশ, আর সিটির ইকোসিস্টেম দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হচ্ছে। এনার্জি উৎপাদনকারী এবং সিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার'র এর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয় পরিবর্তনের সাথে। তথ্য এবং ডাটার সমন্বয়ে পানি, ময়লা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আইটি কানেক্টিভিটি সব একসাথে কাজ করে পুরো কাঠামোকে সহজ করেছে। নাগরিকের প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে ডাটা ব্যবহার করে সকল মানুষের জন্যে স্মার্ট সিটি তৈরি করা সম্ভব। জাপান ভিত্তিক এনইসি ফার্ম ৬ হাজার আইওটি কানেক্টেড ডিভাইস সন্নিবেশিত করেছে ময়লার ডাস্টবিন কতটুকু পূর্ণ হয়েছে জানতে, যেটা জিপিএস নির্ভর ময়লা সংগ্রহের জন্যে অপটিমাইজ করা। স্মার্ট বিন রিসাইকেল এর জন্যে পর্যবেক্ষণে সাহায্য করে, নিউইয়র্ক শহরে ২০০ স্মার্ট ময়লার স্টেশন করা হয়েছে সেন্সরসহ। যার ফলে ৪০ ভাগ সঠিকভাবে রিসাইকেল করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া স্মার্ট ওয়াটার টেকনোলজি পানির মতন গুরুত্বপূর্ণ রিসোর্স'র সোর্স, যত্ন এবং বণ্টনের ক্ষেত্র উন্নতি করে সরবরাহ করে। ইউজার, সিটির পানির ব্যবহার যথাসম্ভব স্বল্প করে ডেলিভারি মূল্য অল্প করে, আর এই পুরো প্রক্রিয়া ট্র্যাক করে।

সেন্সর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়, বৃষ্টির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রিয়েল টাইম

বন্যার পর্যবেক্ষণ করে।

স্মার্ট টেকনোলজি

একটি স্মার্ট শহরের সকল বৈশিষ্ট্য জুড়ে স্মার্ট প্রযুক্তি বা টেকনোলজি থাকে, যেমনঃ বিরামহীন সংযোগ, এবং একই সাথে প্রযুক্তিগুলোর একে অন্যের সাথে একীভূতভাবে কাজ করে, আর সেটা না হলে স্মার্ট ইকোসিস্টেম কাজ করেনা। রিসার্চ প্রতিষ্ঠান 'ফ্রস্ট এন্ড সুল্লিভান'র মতে, স্মার্ট সিটির জন্যে অন্ততপক্ষে ৮০ ভাগ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা প্রয়োজন, যেখানে ৫০ ভাগ পরিবারের একটি করে স্মার্ট হোম থাকবে যার মধ্যে স্মার্ট ডিভাইসগুলির ব্যক্তিগত ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। স্মার্ট শহরগুলি ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্যে বিভিন্ন স্কেলে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যার ফলে সকল নাগরিকের জন্যে সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। একটি শহরের প্রায় প্রতিটি সেক্টরজুড়ে স্মার্ট প্রযুক্তি স্থাপন করা যেতে পারে, শক্তি উৎপাদন থেকে শুরু করে শহরের বর্জ্যকে ব্যবহার করে সার তৈরি করার জন্যে পানির সম্পদ আরও টেকসইভাবে পরিচালনা করা। অবশ্যই স্মার্ট প্রযুক্তি ডাটা দ্বারা পরিচালিত, ডাটা সংগ্রহ না করে এর ক্ষমতা, প্রভাব, পরিবর্তন পরিমাপ করা সম্ভব নয় এবং বড় ডাটা বিশ্লেষণ স্মার্ট প্রযুক্তি গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

স্মার্ট হেলথকেয়ার

স্মার্ট প্রযুক্তির অন্যতম সেক্টর স্বাস্থ্যখাত। স্বাস্থ্যখাতে আইওটি প্রযুক্তি একটি ইকোসিস্টেম তৈরিতে সাহায্য করে, যা রোগী দূর থেকে পর্যবেক্ষণ হয়, এবং হাসপাতালে লোকবলে স্বল্পতা থাকলে সেটা ম্যানেজ করে ফেলে ও যাবতীয় লোকদের অ্যাপইয়েন্টমেন্ট, যাতায়াতের সময় সীমিত করে হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদানকারীদের ওপর চাপ কমায় এবং একজন পেশাদার মেডিকেলের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে। টেলিমেডিসিন থেকে শুরু করে যারা বয়স্ক এবং সক্ষম নয় তাদের জন্যে স্বয়ংক্রিয় ঘরোয়াভাবে সহায়তা, স্মার্ট পরিধানযোগ্য, সেন্সর এবং সংযুক্ত ডিভাইসগুলি স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের উপায় পরিবর্তন করতে পারে। অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ যেমনঃ হাসপাতালে ভাইরাল সংক্রামক রোগ কমাতেও সাহায্য করে। বাজারে এমন ডিভাইসগুলির জন্যেও শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে যা বয়স্কদের দীর্ঘকাল তাদের নিজের বাড়িতে স্বাধীন থাকতে দেয়। আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স টুল ব্যবহার করে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের তাদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে। এতে স্বাস্থ্যখাতে খরচ বাঁচানো যাবে, আইওটি সুবিধা গ্রহণ করে।

স্মার্ট সিটিজেন

স্মার্ট সিটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল স্মার্ট নাগরিক, তারাই স্মার্ট সিটি নির্মাণ করেন এবং সামগ্রিক সাফল্যের জন্যে তারা অপরিহার্য। লোকদের স্মার্ট টেকনোলজিতে প্রবেশের সুবিধা দেয়ার কোন মানে হয়না, যদি তারা কিভাবে এটি ব্যবহার করে উপকার করতে পারে তার কোন ধারণা না থাকে। স্মার্ট প্রযুক্তি ভালো যোগাযোগের ওপর নির্ভর করে। আপনি যদি পুরো পাব্লিক ট্রান্সপোর্টের নেটওয়ার্কের জন্যে একটি বুদ্ধিমান সময়সূচি সিস্টেম ব্যবহার করতে না জানেন, তাহলে আপনি সম্ভবত কাজগুলি ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। স্মার্ট নাগরিকদের অবশ্যই স্মার্ট সিটি বিপ্লবের অংশ হতে হবে, এবং আপনি কখনই কিনতে পাবেন না। শুধুমাত্র নিজের নয়, বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জন্যে। স্মার্ট নাগরিকরা তাদের আশেপাশের শহরের সাথে শিখতে, বিকাশ করতে এবং বৃদ্ধি পেতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং এটি ক্রমাগত উন্নতির একটি চক্র চালাতে সহায়তা করে।

স্মার্ট সিটি কিভাবে কাজ করে

শহরে কিভাবে স্মার্ট সিটির বাস্তবায়নে ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং সেন্সর কাজ করে এবং ডাটা সংগ্রহ করে তার বিভিন্ন ধাপ রয়েছে, সেগুলো তুলে ধরা হল

ডাটা

স্মার্ট সিটির প্রোজেক্ট নেটওয়ার্ক কাজ করে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং সেন্সরের সাহায্যে। এই ডিভাইসগুলি ডাটা সংগ্রহ করে এবং বেসিক তথ্য সরবরাহ করে সকল স্মার্ট সিটির কার্যক্রমজুড়ে। সেন্সরগুলি সংগ্রহ এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে ডাটা প্রেরণ করে, স্মার্ট সিটির অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্তিতে, লোকেশন এবং স্মার্ট সিটি সলিউশনে। এই ডাটা নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সরাসরি মানুষের দ্বারা অথবা সরাসরি নতুবা বিভিন্ন ডিভাইসের মাধ্যমে।

ইন্টিগ্রেশন এপিআই'সহ

বিভিন্ন সোর্স থেকে ডাটা সংগ্রহ করে স্মার্ট সিটিতে ইন্টারনেট অব থিংস বিভিন্নভাবে একীভূতভাবে কাজ করে। অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস ডাটাকে এনেবল করে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে অর্থপূর্ণ রেকর্ড তৈরি করে ব্যবহার করতে। আপনি ডাটা বা তথ্য সংগ্রহ, শেয়ার এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, পাবলিক প্রাইভেট ক্লাউডে, এবং স্মার্ট সিটির ডাটা যেকোন ডিভাইস থেকে যেকোন জায়গা থেকে প্রবেশ করা যায় এবং প্রক্রিয়া একাধিক টিম এবং প্রতিষ্ঠান এর সহযোগিতায় করা যায়।

অ্যাডভান্সড অ্যানালিটিক্স

বৃহৎ পরিসরে অপারেশন এবং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত অ্যাডভান্সড বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল। এটি লোকেশন ভিত্তিক অপারেশন অথবা রিসোর্স বণ্টনে অন্তর্ভুক্ত যেখানে প্রয়োজন নির্ভর। এইরকম বিশ্লেষণ খুব দরকার নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণে, বিশেষ করে জরুরী ক্ষেত্রে। নির্ভরযোগ্য সফটওয়্যার সলিউশন সর্বদা প্রথম পছন্দ যেকোন স্মার্ট সিটি গভর্নেন্স প্রোজেক্টে। স্মার্ট সিটি অ্যাপ্লিকেশনের অত্যাধুনিক অ্যানালিটিঙ ইঞ্জিন রয়েছে, ডাটা পয়েন্ট বুঝতে, এবং প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন করতে তাদের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু প্রকাশিত করতে। শক্তিশালী অ্যানালিটিঙ টুলের মাধ্যমে, স্মার্ট সিটির ডাটা সহজে উন্নত করে সম্ভাব্য মডেলিং টেকনিকের সহায়তা নিয়ে এবং কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে যা সহজতর হয়।

ভিজ্যুয়ালাইজেশন

যখন উন্নত বিশ্লেষণ ডাটা নেয়া হয়, তখন এটি ডাটাতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এবং ট্রেন্ড প্রকাশ করে। ক্রাস্টে তৈরি সমৃদ্ধ ড্যাশবোর্ড, ম্যাটিঙ এবং প্রতিবেদনগুলি ডাটার বিশদ বিশ্লেষণগুলি এবং তাদের থেকে অন্তর্নিহিত আবিষ্কার করতে সহায়তা করে। ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুলস দ্বারা উন্মোচিত অপ্রকাশিত তথ্য দ্বারা সজ্জিত, স্মার্ট সিটি গভর্নেন্স টিমগুলি দ্রুত প্রচুর পরিমাণে ডাটা পরিচালনা করতে পারে এবং শক্তিশালী সফটওয়্যার দ্বারা প্রদত্ত ব্রিহত্র বোঝার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। এই ভিজ্যুয়ালাইজেশনগুলি দলগুলিকে স্টেকহোল্ডারদের লুপের মধ্যে পেতে এবং কমপক্ষে সময়ের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

স্মার্ট সিটি প্রযুক্তি

নতুন প্রযুক্তিসমূহ যা দক্ষতা এবং সাসটেইনেবলিটি উন্নত করে প্রাইভেট সেক্টরে, যা স্মার্ট সিটির নেটওয়ার্ক শক্তিশালি করে। স্মার্ট সিটিতে ব্যবহার কিছু প্রযুক্তি হলোঃ

ইনফোরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি(আইসিটি) ডাটা সম্পর্কিত প্রযুক্তি বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত আইসিটি, যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব কমার্স ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেকনোলোজি আইসিটি'কে সংজ্ঞায়িত করেছে, ধারণ, স্টোরেজ, পুনরুদ্ধার, প্রোসেসিং, ডিসপ্লে, প্রদর্শন, রিপ্রেজেন্টেশন, প্রেজেন্টেশন, প্রতিষ্ঠান, ম্যানেজমেন্ট, সিকুয়েরিটি, প্রেরণ, আর ডাটা এবং তথ্যের আন্তঃ পরিবর্তন।

ইন্টারনেট অব থিংস

ফিজিক্যাল ডিভাইস, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, এবং অন্যান্য ফিজিক্যাল অবজেক্টের একটি নেটওয়ার্ক বুঝায় ইন্টারনেট অব থিংস, যা সেন্সর, সফটওয়্যার এবং নেটওয়ার্ক সংযোগের সাথে এমবেড করা থাকে যা তাদের ডাটা সংগ্রহ এবং ভাগ করতে দেয়। এই কানেক্টেড করা ডিভাইসগুলি যা স্মার্ট অবজেক্ট নামেও পরিচিত এগুলি থার্মোস্ট্যাটের মতো সাধারণ 'স্মার্ট বিল্ডিং' ডিভাইস থেকে শুরু করে স্মার্ট ওয়াচের মত পরিধানযোগ্য যন্ত্র, পরিবহন ব্যবস্থায় এম্বেড করা প্রযুক্তি পর্যন্ত হতে পারে। ওয়াইফাই, বা ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি, আইওটি কার্যকারিতা সমর্থন করে, পাবলিক ওয়াইফাই প্রায়শই আইওটি চালিত শহরের পরিষেবাগুলির মূল হিসাবে বিবেচিত হয়।

অটোমেশন

নূন্যতম মানুষের ইনপুটে কাজ সম্পাদন করার প্রযুক্তি ব্যবহার হল অটোমেশন। স্মার্ট সিটির প্রকল্পগুলিতে অটোমেশন শহরগুলিকে ইন্টারনেট অব থিংস এ সংযুক্ত ডিভাইসগুলির মাধ্যমে রিয়েল টাইম ডাটা প্রেরণ করা হয়। অটোমেশনেরমাধ্যমে, উদাহরণস্বরূপ, রাস্তার লাইটগুলিতে সেন্সরগুলির মাধ্যমে আলো চালু এবং বন্ধ হয়। এই ধরণের সিস্টেমগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু এবং অফ হয়।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স

কম্পিউটার বিজ্ঞান ও শক্তিশালী ডাটাসেটকে একত্রিত করে সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স। স্মার্ট সিটি প্রকল্পগুলি দক্ষতার সাথে এবং টেকসই অবকাঠামো পরিচালনা করতে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং ভিত্তিক সমাধান ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, এআই অ্যালগোরিদমগুলি বর্জ্য সংগ্রহের পথগুলি অপটিমাইজ করতে পারে, যা শহরের আবর্জনা ট্রাকগুলির দ্বারা কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারে। অপরাধ সনাক্ত করতে নিরাপত্তা ক্যামেরা এবং সংযুক্ত ডিভাইস থেকে ডাটা বিশ্লেষণ করে এআই আইন প্রয়োগকারীকে জননিরাপত্তা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

বিগ ডাটা

আইওটির কারণে শহরগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, যা বিগ ডাটা হিসেবে উল্লেখিত। আজ যে পরিমাণ ডাটা তৈরি, প্রক্রিয়া করা, এবং সংরক্ষণ করা হয় তা অভূতপূর্ব। গণপরিবহণ থেকে শুরু করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং যানজট নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে বিশ্বজুড়ে স্মার্ট শহরগুলি ইতিমধ্যেই বিগ ডাটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে। স্মার্ট শহর সফল হওয়ার জন্যে এই ডাটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে। যদি এটিকে ব্যাখ্যা করা এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার করা না যায় তবে বিপুল পরিমাণ ডাটা প্রবেশাধিকার করার কোন মানে নেই এবং এর জন্যে স্মার্ট সিটি সমাধানগুলি প্রায়শই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং এর ওপর নির্ভর করতে হয় যাতে ডাটা দ্রুত ব্যাখ্যা করা এবং সরবরাহ করা যায়।

স্মার্ট সিটির সুবিধা

বিশ্ব উষ্ণতায়নের ফলে, গ্রীনহাউস প্রভাব ও সামুদ্রিক বর্জ্য বৃদ্ধির কারণে মানুষ কার্বন ডাই অক্সাইড প্রভাব কমানোর জন্যে স্মার্ট সিটির কথা ভাবছে পরিবেশগতভাবে শহরগুলিতে খারাপ প্রভাব হ্রাস করতে। স্মার্ট সিটির সুবিধাগুলি হলোঃ

শক্তি সাশ্রয়

স্মার্ট শহরের লাইটগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে শহরের শক্তি সঞ্চয় করে, যেহেতু তাদের স্বল্প শক্তির প্রয়োজন পরে কার্যক্রম পরিচালনা করতে। এলইডি লাইট দীর্ঘ সময় কাজ করে এবং অল্প শক্তি ব্যয় করে।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

স্মার্ট সিটি ডিজাইন করা হয়েছে চলাফেরা এবং সাইকেল ফ্রেন্ডলি রোড এর জন্যে, দক্ষ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, হাঁটাচলার জোন এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিস গাড়ি স্বল্প পরিসরে থাকবে। এটি যানবাহনের দূষণ থেকে মুক্ত রাখে। এতে পরিবেশের উপযোগী বাড়িঘর রয়েছে, যা শক্তি সাশ্রয় করে। স্মার্ট সিটি বাতাসের মান নিয়ন্ত্রণ সেন্সর ব্যবহার করে বাতাসের মান যাচাই এবং দূষণের সোর্স খুঁজে বের করে, এবং এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শহরের বাতাসের মান ভালো করা হয়।

নিরাপত্তা বৃদ্ধি

নিরাপত্তা সকল শহরের জন্যে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। সারভুলেন্স ক্যামেরা ফিসিয়াল রিকগনেশন, মোশন এবং ধোঁয়া নির্ধারক দ্বারা সজ্জিত থাকে এবং ফায়ার অ্যালার্ম শহরগুলিতে থাকে যা নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করে সবাইকে নিরাপদ রাখে।

ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস

একটি স্মার্ট সিটির গুরুত্বপূর্ণভাবে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো থাকে শহরজুড়ে। স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রাফিক সমস্যা কমানো এবং নাগরিকদের রিয়েল টাইম আপডেট দেয়, যা তাদের রাস্তার ব্যাপারে জানতে এবং ভালো যাতায়াত সুবিধা জানতে সহযোগিতা করে।

ডিজিটাল এবং পাবলিক সার্ভিস

নাগরিকদের উচ্চগতির ইন্টারনেট পরিষেবা থাকে সামর্থ্যযোগ্য মূল্যে এবং ডিভাইস ব্যবহার করে। পাবলিক ওয়াই-ফাই'র মাধ্যমে লোকাল এরিয়াতে সমানভাবে নাগরিকদের ডিজিটাল সেবা প্রদান করে। ইলেকট্রিসিটি, পানির অপচয় রোধ এবং প্রযুক্তিগত টুল ব্যবহার করে স্মার্ট সিটিকে আরও বসবাসের উপযোগী করা যায়।

অপরাধ দমন

প্রযুক্তির সহযোগিতায় নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ মানুষের যোগাযোগ, অন্যায় এগুলো পর্যবেক্ষণ করে শহরকে নিরাপদ রাখে এবং অপরাধের হার হ্রাস করে।

স্মার্ট সিটির প্রতিবন্ধকতা

ইন্টিলিজেন্ট টেকনোলজি, ডাটা অ্যানালিটিঙ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি স্মার্ট সিটির পরিচালন কর্মদক্ষতা প্রতিটি সেক্টরে যেমনঃ সরকার, পরিবহণ ব্যবস্থা, ব্যবসা, শক্তি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্বাস্থ্য প্রত্যেক খাতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিবন্ধকতাগুলি হলোঃ

উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাব

স্মার্ট সিটি উদ্যোগের জন্যে ফিজিক্যাল অবকাঠামো এবং তথ্যপ্রযুক্তি সাপোর্ট দরকার। স্মার্ট প্রযুক্তিগুলির সুবিস্তৃত পরিসরে পাবলিক পরিবহণ, শক্তিতে কাজে লাগাতে হয়, অন্যথায় এই প্রযুক্তিগুলি স্মার্ট সিটি রুপান্তর হতে দেয়না। ফিজিক্যাল অবকাঠামোতে ডাটা সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়া করতে হয় সফটওয়্যার, আইটি অবকাঠামোগুলির ব্যবহারে। আর এই সকল ক্ষেত্রে বাজেট ঘাটতি অন্যতম প্রধান সমস্যা স্মার্ট সিটি গড়ে তোলা।

স্বচ্ছতা এবং ডাটা প্রাইভেসি

স্মার্ট সিটি নির্ভর করে বিভিন্ন সোর্স থেকে ডাটা সংগ্রহ এবং সেটা পর্যবেক্ষণে। সমস্যা হচ্ছে, আপনাকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে যেহেতু প্রাইভেসি ইস্যু রয়েছে। আপনাকে ঠিক করতে হবে কোথায় ডাটা বা তথ্য সংরক্ষণ করবেন, কি নিরাপত্তা প্রয়োজন। সেটা ব্যক্তিগত তথ্য কিংবা মেডিকেল রেকর্ড যেটাই হোক না কেন। যেসকল দেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তেমন শক্তিশালী নয়, সেই ক্ষেত্রে ফেসিয়াল রিকগনেশন ট্র্যাক এই ব্যাপারগুলি সতর্কতা থাকেনা। কাস্টমার তথ্য প্রাইভেসির জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ক্যালিফোর্নিয়া কঞ্জুমার প্রাইভেসি অ্যাক্ট চালু রয়েছে।

পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর সমন্বয়

ডাটা পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টর থেকে সংগ্রহীত হয়, এবং এটা সহজ নয় কোন তথ্য শেয়ার হবে। ডাটা শেয়ার খুব জরুরী সঠিক কার্যক্রম পরিচালন, সার্ভিস এবং ডাটা নিয়ন্ত্রণে। স্মার্ট সিটি প্রাইভেট এবং সরকারের মধ্যে ভালো সমন্বয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠে সাসটেইনেবল প্রোগ্রাম গড়ে তুলতে।

আর্থিক বিষয়

স্মার্ট সিটির অনেক রিসোর্স মেইনটেইন করার প্রয়োজন পরে। বাস্তবায়ন,

কার্যক্রম পরিচালন, এবং স্মার্ট প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ দরকার। ফিজিক্যাল এবং আইটি অবকাঠামো উপরের প্রযুক্তিগুলির জন্যে অভিজ্ঞতা এবং দক্ষ ব্যক্তি এবং অর্থের দরকার পরে। সকল শহরের আর্থিক ক্ষমতা থাকেনা স্মার্ট সিটি উদ্যোগে, আর এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

শক্তির প্রয়োজনীয়তা

সেন্সর এবং ক্যামেরা প্রযুক্তি শুধু স্মার্ট সিটিতে ব্যবহার হয়না, স্মার্ট প্রযুক্তি নির্ভর করে শক্তির ব্যবহারের ওপর। যেমনঃ শহরের শক্তির উৎস কি পর্যাপ্ত নাকি? এরপর বিকল্প শক্তির উৎস কি যদি ঠিকমতন কাজ না করে। স্মার্ট সিটি কি বায়ু, জল কিংবা সূর্য্যের আলোক শক্তি দ্বারা পরিচালিত? অথবা ডিজেল দ্বারা। কি সিস্টেম পরিচালিত হওয়া ঠিক। এইসব বিষয় খেয়াল রাখা জরুরী।

সামাজিক এবং ইকোনমি ইস্যু

স্মার্ট শহরগুলির ক্ষেত্রে জাতি, শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্ট সমস্যাগুলি সমাধান করেনা। তাই এই বিষয়গুলি প্রাধান্য দেয়া উচিত এবং পদক্ষেপ নেয়া দরকার। যাতে ধনী শক্তিশালী নাগরিকদের পাশাপাশি প্রান্তিক নাগরিকরা ঠিকে থাকতে পারেন।

বিশ্বের সেরা কিছু স্মার্ট সিটি

স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের অনেক দেশ তাদের শহরগুলিকে জনগণের জন্যে আধুনিক বসবাসের উপযোগী করে তুলছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু শহরের কথা তুলে ধরা হল।

অসলো, নরওয়ে

সাসটেইনেবল, ইকো-ফ্রেন্ডলি পরিবেশের স্মার্ট সিটি অসলো। এই শহরে ৬৫০,০০০ এর বেশি এলইডি লাইট কানেক্টেড রয়েছে যা স্ট্রেশনগুলোতে প্রোসেসিং করে এবং প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে। এছাড়া শহরের সকল যানবাহন ইলেকট্রিক করার চেষ্টায় রয়েছে ২০২৫ সাল নাগাদ, যদিও এই শহরে প্রায় ৬৭০,০০০ জনগণ রয়েছে। শুন্য নির্গত গাড়ি ফ্রি পার্কিংসহ সুবিধা, বাস লেন, এবং স্বল্প ট্যাঙ সুবিধা ও টোল মূল্য। এখন লাইসেন্স প্লেট ডিটেকটর পর্যবেক্ষণ করে রাস্তার ট্রাফিক প্রবাহ বুঝার চেষ্টা করা হয়, অসলো শহর মূলত ডাটা নির্ভর কাজ করে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি করছে।

সিঙ্গাপুর

শহরটির জনগণ বয়স্ক হচ্ছেন, আর সরকার ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতাতে গুরুত্ব দিচ্ছেন তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগামিতার জন্যে। তারা ডিজিটাল হেলথকেয়ার সিস্টেমে পুরোপুরি ধাবিত হয়েছে, ভিডিও কনসাল্টিং এবং ওয়ারেবল আইওটি ডিভাইসের মাধ্যমে দূর থেকে রোগীর পর্যবেক্ষণ করে। সিঙ্গাপুর বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনবহুল শহর এবং তাদের স্মার্ট ন্যাশন ভিশন হচ্ছে ডিজিটালি সেন্সরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। এই সেন্সরগুলো ব্যাপক পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করে নাগরিকদের ব্যাপারের প্রতিদিন এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোন এলাকা বেশ জনবহুল ও কোন এলাকা পরিষ্কার করতে হবে। সিঙ্গাপুর প্রথম দেশ হিসেবে ইকো স্মার্ট সিটি ডেভেলপ করতে যাচ্ছে, যা যানবাহন মুক্ত হবে যা এর পশ্চিমাংশে টেনগাহ অঞ্চলে হবে। ৪২,০০০ বাড়ি হবে, আর সেখানের বাসিন্দারা সাইকেল ব্যবহার করবে।

সাংহাই, চীন

'স্মার্ট সিটি অ্যাওয়ার্ড'তে ভূষিত হয়েছে চীনের সাংহাই শহর, যা প্রযুক্তিগতভাবে বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসরমান শহর। তাদের ৯৯ ভাগ ৫জি নেটওয়ার্ক কভারেজ রয়েছে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে, যা ৩১,০০০ কানেক্টিভিটি স্টেশনের বেশি বর্ধিত। এর ই-গভর্নমেন্ট সিস্টেম ইন্টার্যাক্টিভ টুলের কারণে সকলের কাছে প্রশংসিত ১৪.৫ মিলিয়ন ব্যবহারকারীকে সার্ভিস সুবিধা প্রদানের কারণে।

আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড

ইউরোপের স্মার্ট শহরের মধ্যে ১০০ এর মধ্যে ৭৫.৪ স্কোর সাসটেইনেবল এর বিষয়ে। ২০৫০ সালের মধ্যে ইউরোপের প্রথম দেশ হিসেবে শূন্য কার্বন'র শহর বিশ্বে অবস্থান তৈরি করতে চায়, ইকো ফ্রেন্ডলি ট্রান্সপোর্ট শহরে পরিণত হতে চায়। ৫৫৩ এর বেশি সবুজ সার্টিফায়েড বিল্ডিং রয়েছে, যা অন্য শহরগুলোর চেয়ে ইনডেক্সে এগিয়ে এবং প্রতি ১ লক্ষ মানুষের জন্যে ৬৭ ভাগ ইলেকট্রিক যানবাহন রিচার্জিং স্টেশন রয়েছে।

কারা স্মার্ট সিটিতে বিনিয়োগ করছে

বিশ্বের জায়ান্ট কোম্পানিগুলি এবং ধনী রাষ্ট্রগুলো স্মার্ট সিটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে সেটা নির্মাণে বিনিয়োগ করছে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির সহায়তা বিভিন্ন দেশ এবং কোম্পানি মানুষের বসবাসকে প্রযুক্তির সহায়তায় আরও সুন্দর করে বসবাস উপযোগী করছে। ২০১৭ সালের 'নেভিগেন্ট রিসার্চ'র মতে, 'সিসকো' কোম্পানি ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে ২০১৭ সালে স্মার্ট সিটি নির্মাণে তার আইওটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে, যেই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সিটি লাইট, পার্কিং, নিরাপত্তা, ট্রান্সপোর্ট'র মতন অনেক কিছু ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ২০২০ সালে 'সিসকো' সাইবার ভিশন প্রোডাক্ট তৈরি করে যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইওটি সিস্টেমে গুরুত্ব দেয়। অপরদিকে, আরেক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'মাইক্রোসফট' ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে স্মার্ট সিটির কার্যক্রমের জন্যে। ওয়ালমার্ট, শেভরন এবং জনসন'র মতন প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট এর ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। যেমনঃ 'জনসন' কোম্পানি স্মার্ট থারমোস্ট্যাট তৈরি করেছে ঘরের জন্য যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

২০১৭ সালে মাইক্রোসফট এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস বিনিয়োগ সংস্থা 'ক্যাসকেড'র ২৪,৮০০ একর জমিতে একটি শেয়ার কিনে, যা নতুন একটি স্মার্ট সিটিতে পরিণত হবে। ফার্মটি উচ্চগতির ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, ডাটা সেন্টার, স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের জন্যে পরিকাঠামো, স্বয়ংক্রিয় লজিস্টিক হাব এবং আরও অনেক কিছুর মত বৈশিষ্ট্য ডিজাইন এবং তৈরিতে ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। অপরকে, 'টেলেনসা' নামে কোম্পানি বিশ্বজুড়ে ২ মিলিয়নের বেশি স্মার্ট রাস্তার লাইট সন্নিবেশিত করছে ৪০০ শহরজুড়ে, যা ৩০ ভাগ শক্তি ব্যয়ের অর্থ সাশ্রয় করছে। 'সিটি নেক্সট ইনিশিয়েটিভ' হিসেবে মাইক্রোসফট তাদের আজ্যুয়ের প্ল্যাটফর্মে স্মার্ট সিটি টেক'র ওপর কাজ করছে, যা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে যেমনঃ ডিজিটালাইজেশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং সাসটেইনেবিলিটি।

গুগলের মূল কোম্পানি 'অ্যালফাবেট' ২০১৭ সালে ঘোষণা দেয়, প্রতিষ্ঠানটি কানাডার টরেন্টো'তে ওয়াটারফ্রন্টে ৮০০ একর জায়গাতে একটি উন্নত স্মার্ট সিটিতে পরিণত করার জন্যে কাজ করছে। শহরটিতে সেলফ ড্রাইভিং কার, স্মার্ট স্ট্রিট লাইট, পাবলিক ওয়াইফাই হাব, রিয়েল টাইম ট্রান্সপোর্টেশন এবং পার্কিং তথ্যসহ বিল্ডিংগুলিকে উন্নত জীবনের উপযোগী করতে শহরকে ডিজাইন করা হবে।

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান 'অ্যামাজন'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস (এডাব্লিউএস)' স্মার্ট সিটির জন্যে ক্লাউড ভিত্তিক আইওটি সেন্সর প্রোডাক্ট, ম্যানেজমেন্ট টুল, স্টোরেজ, ডাটাবেজ, অ্যানালিটিঙ'র মতন আরও পরিষেবা প্রদান করে। এই প্রযুক্তিগুলি বিস্তৃত পরিসরে পানি ম্যানেজমেন্ট, রিমোট রোগী পর্যবেক্ষণ, ট্রান্সপোর্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্যে ব্যবহার হয়। উদাহরণস্বরূপ, এডাব্লিউএস'র পার্ক স্মার্ট নামে একটি সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যা একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে রিয়েল টাইম পার্কিং তথ্য সরবরাহ করতে ভিডিও সরবরাহ করে।

স্মার্ট সিটির ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগ

ইউনাইটেড ন্যাশনস ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ (ইউএনইসিই) বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা 'ইউনাইটেড স্মার্ট সিটিস (ইউএসসি)' নামে পরিচিত। যেটা ইউনাইটেড ফর স্মার্ট সাসটেইনেবল সিটিস ইমপ্লিমেন্টেশন প্রোগ্রাম এর সাথে একীভূতভাবে কাজ করছে। ইউএসসি শহরগুলিকে স্মার্ট হতে সহযোগিতা এবং সাসটেইনেবল আরবান সলিউশন হতে সহায়তা করছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি, বিভিন্ন দেশের সাথে একীভূতভাবে কাজ করে। বর্তমানে ১৭ টি ইউএন এজেন্সিকে সাপোর্ট দিচ্ছে। ইউএসসি প্ল্যাটফর্মটি বার্সেলোনা থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভার জেলাগুলো পর্যন্ত স্মার্ট সিটিতে রুপান্তরের চেষ্টা করছে। প্রথমে একটি শহরের অবস্থাকে মূল্যায়ন করে সাসটেইনেবলিতে এর পারফর্মেন্স নির্ধারণ করে। এরপরে পরামর্শ সেবা দান করে একটি শহরকে কোন এলাকাতে অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা যাবে। এগুলোর পরে ইউএসসি ফান্ড প্রদান করে পাবলিক প্রাইভেট সেক্টরে পার্টনারশিপ ভিত্তিতে শহর উন্নয়নে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল শহর প্রথম দিককার স্মার্ট সিটি বিশ্বের, তারা ময়লা নিয়ে কি করতে হবে সেটার সমাধা ন বের কর করে। ১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত ল্যান্ডফিলগুলি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান মাধ্যমে ছিল, কিন্তু সিউল রিসোর্স রিকভারি সুবিধার সাথে সবাইকে পরিচিত করালো যেখানে ৯৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কঠিন শহুরে বর্জ্য জ্বালিয়ে বর্জ্যকে শক্তিতে রুপান্তরিত করে, যা তাদের শক্তির আরেকটি উৎস হিসেবে তাপকে কাজে লাগাতে দেয়।

ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট স্মার্ট সিটি মিশন'র যাত্রা শুরু করেছে দেশটি জুড়ে ১০০ স্মার্ট সিটি নির্মাণের প্রত্যাশা নিয়ে। ২০১৮ সাল থেকে দেশটির সরকার ফান্ড দেয়া শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ, জয়পুর শহরে ভারত সরকার 'মেগা ডাটা' তৈরি করতে বায়ুর মান নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণ স্থাপনে সহায়তা করছে একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকদের প্রবেশের সুবিধা দিয়ে। স্মার্ট পার্কিং ম্যানেজমেন্ট প্রযুক্তি মধ্যপ্রদেশ জুড়ে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে সেন্সর এবং ক্যামেরা ডাটা সংগ্রহ করবে, সাম্প্রতিক সমস্যা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করবে।

স্মার্ট সিটি'র পথে বাংলাদেশ

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে প্রথম স্মার্ট সিটি'র প্রাথমিক পরিকল্পনা করে বাংলাদেশ সরকার। গাজীপুর জেলার রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও কালীগঞ্জ উপজেলায় শীতলক্ষ্যা ও বালুনদী দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দ্যেশ্য ছিল। ২০১৬ সালের পরে ২০১৮ সালে 'পূর্বাচল নিউ টাউন' প্রকল্পটি উচ্চমানের অবকাঠামো এবং সমসাময়িক সুযোগ সুবিধাসহ একটি স্মার্ট সিটি তৈরি করার সরকারের প্রাধান্য ছিল, যা হবে ৩০ সেক্টরে বিভক্ত বৃহত্তম পরিকল্পিত মহানগর ও যেটা বর্তমানে অনেকাংশে দৃশ্যমান। ৬,২২৮ একর এলাকাজুড়ে এই স্মার্ট সিটির নিজস্ব পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি বর্জ্য শোধন পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা থাকবে। এই পূর্বাচল শহরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আধুনিক যোগাযোগ ও নিরাপত্তা পরিষেবা সবই বিদ্যমান থাকবে। যথারীতি 'ঢাকা ইন্টারন্যাশানাল ট্রেড ফেয়ার' সেন্টার এখানে হয়েছে এবং একটি স্টেডিয়াম হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। চীনের বেইজিং ভিত্তিক 'চায়না রোড এন্ড ব্রিজ কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠান ১ লক্ষ কোটি টাকার দুইটি প্রোজেক্ট নিয়ে ২০১৯ সালে বা ংলাদেশের রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) 'র সাথে এমওইউ চুক্তি স্বাক্ষরিত করে এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে। এই দুই প্রোজেক্টের মধ্যে একটি কেরানীগঞ্জ, যাতে ৫,০১৯ একর জায়গার ওপর ৫২,০০০ কোটি ব্যয়ে স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্যে অ্যাপার্টমেন্ট'র 'ওয়াটারফ্রন্ট স্মার্ট সিটি প্রোজেক্ট' এবং অপরটি হচ্ছে, আশুলিয়াতে 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট', যেটা ৯,৫৯১ একর জায়গাতে নির্মাণ হবে। সিলেট শহরকে স্মার্ট সিটি রুপান্তরে ২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং এডোটকো বাংলাদেশ, রেজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো সার্ভিস প্রতিষ্ঠান এশিয়ার, সিলেট এর নাগরিকদের জন্যে স্মার্ট সিটি তৈরিতে লক্ষ্যে চুক্তি করে। একই বছর বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত নওকি বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি'র উন্নয়নে জাপানের আগ্রহের কথা বলেন। জাপান যথারীতি বেশকিছু এলাকাতে অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। ২৫০ বিলিয়ন ইয়েন (জাপানি মুদ্রা) ফান্ড নির্ধারণ করেছে দেশটি স্মার্ট সিটির উদ্যোগ হিসেবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ২৬ টি শহরে ডিকার্বনাজেশন প্রচেষ্টা হিসেবে। চীনের রাষ্ট্রয়াত্ত চারটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব খরচে বাংলাদেশের চট্রগ্রামের সমুদ্র তীর পতেঙ্গা থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত ৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত একটি স্মার্ট সিটি গড়ার প্রস্তাব ২০২২ সালে চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব দেয়।

ভবিষ্যতবাদীরা সর্বদা ভবিষ্যতের শহরগুলি কল্পনা করেছে যেখানে বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীরা উন্নতি লাভ করছে। সমন্বিত এবং মসৃণভাবে পরিচালিত এই আধুনিক শহুরে পরিবেশগুলি উন্নত মাল্টিমডাল পরিবহণ ব্যবস্থা, স্বায়ত্তশাসিত পাওয়ার গ্রিড, পরিষ্কার এবং নিরাপদ এলাকা, সমন্বিত পরিষেবা এবং অর্থবহ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পূর্ণ থাকবে। যদিও একটি উন্নত ভবিষ্যৎ এর দিকে শহর এবং সম্প্রাদায়গুলি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অভিবাসন এবং টেকসই সমস্যাসহ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। স্কুল থেকে ব্যবসা, পরিবহণ থেকে শক্তি, একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নগর জীবনের প্রতিটি দিকের সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে। একসাথে কাজ করার মাধ্যমে নাগরিকদের জীবনকে উন্নত করতে এবং একটি ভাল ভবিষ্যৎ তৈরি করতে নতুন ধারণা এবং নতুন প্রযুক্তিগুলি দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

স্মার্ট এন্টারটেইনমেন্টকে ক্রিয়েটিভ ইকোনোমির অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: পলক

প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ যখন তার দৈনন্দিন কাজ করছে তখন বেশ কিছু হিংসাত্মক মনোভাব মুহূর্তেই স্মার্ট বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার মধ্যে বিভেদ, সংহিংসতা ও ঘৃণা ছড়ানোর অপচেষ্টা চলছে বলে সতর্ক বার্তা দিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

এজন্য সাইবার বুলিং এর বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরির করতে ডিজিটাল লিটারেসি বাড়ানো ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি।

এজন্য বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল ও ইউএনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে শুরু হওয়া ডিজিটাল পিস মুভমেন্টকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।

পলক বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম অনুষঙ্গ স্মার্ট এন্টারটেইনমেন্ট ও মিডিয়া। সেজন্য আমরা ফিউচার এনিমেটেড অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ইকোনোমি (ফেস অব অব স্মার্ট বাংলাদেশ) প্রকল্প হাতে নিয়েছি।
এই প্রকল্পে বেশ কিছু এআই টুলস ব্যবহার করে এনিমেশন শিল্পের বিকাশ ঘাটানো হবে। ভবিষ্যত স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট এন্টারটেইনমেন্টকেও আমরা ক্রিয়েটিভ ইকোনোমির অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

গত রবিবার বিকেলে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে 'ক্যামেরায় গাঁথি স্মার্ট বাংলাদেশের গল্প প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিত 'শান্তি চলচ্চিত্র উৎসব- ২০২৩' এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শান্তি, সহনশীলতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে সমমর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে বৈষম্যহীন সমতাভিত্তিক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে স্মার্ট চলচ্চিত্রের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন পলক।

নাট্যজন রোকেয়া প্রাচীর সঞ্চালনায় ও বিসিসি নির্বাহি পরিচালক রণজিৎ কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আইসিটি বিভাগের সচিব মো. সামসুল আরেফিন, ইউএনডিপি বাংলাদেশের সিনিয়র গর্ভর্নেন্স স্পেশালিষ্ট শীলা তাসনিম হক, এটুআই প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট মানিক মাহমুদ, ফিল্মস ফর পিস ফাউন্ডেশনের সভাপতি শিপা হাফিজা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
আইসটি সচিব বলেন, স্মার্ট নাগরিককে দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হতে হবে। এই দুটি গুণ থাকলেই তার কাছ থেকে আমরা শান্তি পেতে পারি। এদের মাধ্যমেই আমরা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

১৬০টি ছবির মধ্যে ২৫টি চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করা হয়।১৬০টি ছবির মধ্যে ২৫টি চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃত করা হয়। ফিকশনে আত্মিক, মিরাকল ইন হ্যাভেন,ফ্রেগরেন্স, হুঁশ, এ নাইট টেইল, সদয় ফকিরের পাঠশালা; নুঅইন, হিউম্যান, নন্দিত নরকে, বেনিয়ান, মরিচীকা, রংপিন্সল, এন্টিটি, চৈতন্য, স্লিপস অব মাইন্ড; ভিডিও কন্টেন্টে ম্যাসেঞ্জার, দানবাক্স, অগ্রগামিনী, চাকরি নাই, হাসি, স্কৃপ্টে বর্ণমালা, বিফর দ্য বিগিনিং, উধাও।

কৃত্রিম মঙ্গল গ্রহে এক বছর থাকার অভিজ্ঞতা জানালেন চার অভিযাত্রী

দীর্ঘদিন ধরেই মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা।

কিউরিওসিটি নামের রোভার যান পাঠিয়ে মঙ্গল গ্রহের নানা রহস্য জানার পাশাপাশি গ্রহটিতে মানুষের বেঁচে থাকার কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন নাসার বিজ্ঞানীরা।

গবেষণার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনের জনসন স্পেস সেন্টারে মঙ্গল গ্রহের আদলে কৃত্রিম আবাসস্থলও তৈরি করেছেন তাঁরা।

মঙ্গল গ্রহের পরিবেশে এক বছর অবস্থান করে ৬ জুলাই চারজন অভিযাত্রী পৃথিবীর উন্মুক্ত পরিবেশে বের হয়েছেন। শুনিয়েছেন দীর্ঘদিন মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ থাকার অভিজ্ঞতা।

স্পেস এজেন্সির ক্রু হেলথ অ্যান্ড পারফরম্যান্স এক্সপ্লোরেশন অ্যানালগ প্রকল্পের আওতায় গত বছরের ২৫ জুন মঙ্গল গ্রহে যান কেলি হ্যাস্টন, আঙ্কা সেলারিউ, রস ব্রকওয়েল ও নাথান জোন্স নামের চার স্বেচ্ছাসেবী অভিযাত্রী।

মঙ্গলগ্রহের আবহে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টেড আবাসস্থলে অবস্থান করেন তাঁরা। এ সময় সিমুলেটেড স্পেসওয়াকের মাধ্যমে মঙ্গলের বুকে হাঁটার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাঁরা।

নিজেদের আবাসস্থল রক্ষার পাশাপাশি গত এক বছরে মঙ্গল গ্রহের পরিবেশে শাকসবজিও চাষ করেছেন তাঁরা। মঙ্গল গ্রহের কৃত্রিম পরিবেশে এক বছর থাকার অভিজ্ঞতা জানিয়ে মিশন কমান্ডার হ্যাস্টন বলেন, 'হ্যালো! আপনাদের সবাইকে হ্যালো বলতে পারা আসলেই খুব চমৎকার।

আমাদের ৩৭৮ দিনের বন্দিত্ব দ্রুত কেটে গেছে। মঙ্গল গ্রহে পরিচালিত মিশনের অনুকরণে ১৫৭ বর্গমিটার জায়গায় থাকতে হয়েছে আমাদের। চাঁদের ওপারে মানুষকে নিয়ে যেতে এই মিশন বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে বার্তা পাঠাতে ২২ মিনিটের মতো সময় লাগে, অভিযাত্রীরাও ২২ মিনিট দেরি করে যোগাযোগের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন।

ভাবুন তো, বন্ধুকে কল করার ২২ মিনিট পর উত্তর পাচ্ছেন। আরও দুটো এমন মিশন পরিকল্পনা আছে। অভিযাত্রীদের সিমুলেটেড স্পেসওয়াকের মাধ্যমে শারীরিক ও আচরণগত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে নাসা।

জনসন স্পেস সেন্টারের ডেপুটি ডিরেক্টর স্টিভ কোরনার বলেন, 'এই অভিযান গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মঙ্গল গ্রহে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এ জন্য ক্রুদের পুষ্টির বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। অনেক ধরনের পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকতে হয়েছে অভিযাত্রীদের।'

অভিযানের ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ব্রকওয়েল বলেন, 'উত্তেজনাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে এক বছর বেঁচে থাকার এই অবিশ্বাস্য সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'

নগদ মেগা ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে আকর্ষণীয় উপহার পেলেন বিজয়ীরা

দেশের সেরা মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান নগদের বৃহত্তম লেনদেন ক্যাম্পেইনের বিভিন্ন পর্যায়ের আরো ৩১ জন বিজয়ীর পুরস্কার হস্তান্তর করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

নগদের প্রায় ২০ কোটি টাকার এই ক্যাম্পেইনের ইতিমধ্যে চারটি দল ও একজন মালয়েশিয়া প্রবাসী বুঝে পেয়েছেন ঢাকায় নিজেদের জমি।

সম্প্রতি নগদের প্রধান কার্যালয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্কেটিং অফিসার সাদাত আদনান আহমেদ এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডেপুটি চিফ মার্কেটিং অফিসার মোহাম্মদ সোলাইমান।

পবিত্র রমজান মাসে প্রতি বছরই দারুণ সব আকর্ষণীয় অফার নিয়ে আসে নগদ। গত বছর ছিল বিএমডব্লিউ, সেডানগাড়ি, মোটরসাইকেল, টিভি, ফ্রিজসহ বিভিন্ন পুরস্কার জেতার সুযোগ।

এবার নগদ ঢাকায় জমি দেওয়ার মাধ্যমে বৃহত্তম লেনদেন ক্যাম্পেইন করেছে এবং গ্রাহকদের বিপুল সারা পেয়েছে। ঢাকায় জমির ক্যাম্পেইনে ইতিমধ্যে পাঁচজনকে জমি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাকিদেরও জমি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যারা ইতিমধ্যে ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়েছেন এবং পুরস্কার জিতে নিয়েছেন, তারা ছাড়া এই ক্যাম্পেইনে পুরস্কার জেতার সুযোগ আর নেই।

কারণ গত ৩০ জুন থেকে ক্যাম্পেইনটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। লেনদেন করে, রেমিট্যান্স গ্রহণ করে এবং দল বানিয়ে টেলিভিশন, ফ্রিজ, এসি, স্মার্ট ফোন পুরস্কার জিতেছেন মো. আরিফুল ইসলাম, মো. জসিম উদ্দিন, মো. মাসুদ খান ও মো. গিয়াসউদ্দিন মোল্লা।

ইনফ্লুয়েন্সার্স ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতেছেন রাহাত আহমেদ সীমান্ত ও রিফাত বিন সিদ্দিক। এছাড়া ভিউয়ার্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন শেখ সুফিয়ান ও আফরিন লিজা।

এরকম আরো বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৩১ জন বিজয়ী মেগা ক্যাম্পেইনের পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। মেগা ক্যাম্পেইনের পুরস্কার বিতরণের সময় নগদের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্কেটিং অফিসার সাদাত আদনান আহমেদ বলেন, 'নগদের মাধ্যমে অনেক মানুষের ঢাকার বুকে জমির মালিক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

এছাড়া নগদের এবারের মেগা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ২০ কোটি টাকার উপহার বিতরণ করেছি আমরা। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রাহকদের বিপুল সাড়া পেয়েছি, আশা করি ভবিষ্যতে আমরা গ্রাহকদের জন্য এমন আরো দারুণ অফার নিয়ে আসব।'

হ্যাকিংয়ের ইতিহাসে রেকর্ড, ৯৯৫ কোটি পাসওয়ার্ড চুরি

হ্যাকিংয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘিরে গোটা বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়েছে। 'ওবামা কেয়ার' নামে এক হ্যাকার চুরি করা প্রায় ৯৯৫ কোটি পাসওয়ার্ডের একটি সংকলন প্রকাশ করেছে।

এই পাসওয়ার্ডগুলির মধ্যে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া পার্সওয়ার্ড থেকে ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড। এই পাসওয়ার্ড হ্যাকিং রাতারাতি হয়নি।

প্রায় এক দশক ধরে একটু একটু করে এই পাসওয়ার্ড হ্যাক করা হয়। হ্যাক করা পাসওয়ার্ডগুলোতে পুরনো ও নতুন সব ধরনের পাসওয়ার্ডই রয়েছে।

হ্যাকাররা ব্রুট ফোর্স প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এই কাজ করেছে। 'দ্য রক ইউ ২০২৪' নামের এই সংকলন একটি বিশেষ ফাইলে নিয়ে তা ক্রাইম ফোরামে তুলে ধরা হয়েছে।
এতে খুব সাধারণ পাসওয়ার্ডও রয়েছে। 'ওবামা কেয়ার' নামের ওই হ্যাকার হ্যাকিংয়ের সময় সাধারণত লিখে থাকে, এই বছরের বড় দিন অনেকটা আগেই এসে গেল, রইল তোমাদের বড়দিনের উপহার।

পাসওয়ার্ড নিয়ে সতর্ক থাকতে ও প্রতারণা থেকে বাঁচতে করণীয়
এত বড় সাইবার অপরাধ গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়ে দিয়েছে। এর আগে ২০২১ সালে 'রক ইউ ২০২১' ফাঁস করেছিল হ্যাকাররা। সতর্ক থাকতে যা করবেন পাসওয়ার্ড একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পাল্টে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনকে বেছে নিয়ে সেদিন সব পাসওয়ার্ড পাল্টে ফেলুন।

ব্যাংকের অ্যাপের লগইন পিন, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অ্যাপের পিন, ডেবিট কার্ডের পিনও পাল্টে ফেলার কথা বলা হচ্ছে।

এছাড়া আপনি টাকার লেনদেন করেননি কিংবা টাকার লেনদেন হয়ে গিয়েছে- এমন একটি ম্যাসেজ আপনার কাছে আসলে থাকলে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরি করেছে ফ্রান্স

১৯টি বিশাল কয়েল দিয়ে তৈরি একাধিক টরয়েডাল চুম্বকের সমন্বয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরি করেছে ফ্রান্স।

ইন্টারন্যাশনাল ফিউশন এনার্জি প্রজেক্ট ফিউশন রিঅ্যাক্টর নামের এই পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ২ হাজার ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার।

বিশাল এই চুল্লি তৈরিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ভারতসহ ৩৫টি দেশ সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। পারমাণবিক ফিউশন চুল্লি তৈরির কাজ শেষ হলেও এটি ২০৩৯ সাল নাগাদ চালু করা হতে পারে।

ফিউশন আর ফিশন শব্দের মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য রয়েছে। ফিউশন পদ্ধতি বর্তমানে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়।

একটি পরমাণুকে বিভক্ত করার পরিবর্তে দুটি পারমাণবিক নিউক্লিয়াসকে যুক্ত বা ফিউজ করে এ পদ্ধতি। আর তাই নতুন এই চুল্লিতে ফিউশন শক্তির মাধ্যমে জ্বালানি তৈরি করতে চান বিজ্ঞানীরা।

এর মাধ্যমে বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে চান তাঁরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, বিশাল এই চুল্লিতে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী চুম্বক রয়েছে।

এই চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র পৃথিবীকে ঘিরে রাখা চৌম্বকক্ষেত্রের চেয়ে ২ লাখ ৮০ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। গত ৭০ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক ফিউশনের শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন।

এই প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম তৈরি করতে খুব বেশি উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুকে ফিউজ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় নক্ষত্র পদার্থকে আলো ও তাপে রূপান্তরিত করে।

এই প্রক্রিয়ায় কোনো গ্রিনহাউস গ্যাস বা দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদন হয় না। ফিউশন রিঅ্যাক্টরের নকশায় টোকামাক নামের বিশেষ একটি যন্ত্র থাকে।

এই যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রসহ একটি ডোনাট আকৃতির চুল্লি থাকে। চেম্বারের ভেতরে প্লাজমা উত্তপ্ত করা হয়। পারমাণবিক ফিউশন ঘটানোর জন্য প্লাজমার কয়েল অনেক সময় ধরে রাখা বেশ চ্যালেঞ্জিং।

গোপালগঞ্জে স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং ভাষার উপর ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রোগ্রামিং শিক্ষাকার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে তৈরী এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের শিক্ষকদেরকে স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং এ আরো বেশি দক্ষ করার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ৫-৬ ই জুলাই, ২০২৪ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সদর উপজেলার ১১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং ভাষার উপর ০২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ, স্ক্র্যাচ বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম পর্বের সহযোগিতায় ছিল সিএসএল টেকনোলজিস লিমিটেড এবং বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)।

এ কর্মশালার প্রথম পর্বের সমাপনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহসিন উদ্দীন বলেন,"বর্তমানে ইন্টারনেটের এই যুগে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর সময় নষ্টকারী কন্টেন্ট এর আধিক্য দেখা যাচ্ছে।

এর মাধ্যমে আমাদের বাচ্চাকাচ্চাদের মেধা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিনষ্ট হচ্ছে। স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং সম্পর্কিত ইউটিউব কন্টেন্টগুলো দেখার পাশাপাশি নিয়মিত প্রাকটিসের মাধ্যমে আমাদের সন্তানরা এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার পরিমল চন্দ্র বালা, সহকারী শিক্ষা অফিসারগণসহ আয়োজক হিসেবে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার পক্ষ থেকে গোবরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম চৌধুরী টুটুল উপস্থিত ছিলেন।

দুইদিনের এই কর্মশালায় ব্লকভিত্তিক প্রোগ্রামিং ভাষা স্ক্র্যাচ দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে প্রোগ্রামিং ও গণিতের ধারণা দিয়ে বিভিন্ন যুক্তি ব্যবহার করে গেইম এবং এনিমেশন তৈরি করার বিষয়গুলো হাতেকলমে দেখানো হয়।
শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এ প্রোগ্রামিং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা নিয়ে তাদের উচ্ছাস প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে নিলখী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হাফিজা খানম বলেন,"স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বাচ্চারা যুক্তিভিত্তিক সমস্যা সমাধানে আগহী হবে এবং এটি তাঁদের মোবাইল আসক্তি দূর করে গঠনমুলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করবে।

এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার নিয়মিত আয়োজন দেশের প্রাথ মিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রোগ্রামিং শিক্ষাকার্যক্রমে সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি দেশের সকল স্তরের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রোগ্রামিং ভীতি দূর করে জটিল সমস্যা সমাধানে আগ্রহী করে তুলবে বলে বিশ্বাস করেন বিডিওএসএন এর সাধারণ সম্পাদক মুনির হাসান।
উল্লেখ্য, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ২২৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার প্রথম পর্বে ১১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

প্রথম পর্বে প্রত্যেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে একজন করে আইসিটি শিক্ষক এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী ধাপে বাকি ১১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণদের নিয়ে কর্মশালার দ্বিতীয় পর্ব আয়োজন করা হবে।

উভয়দিনই সকাল ১০ টা থেকে শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা শেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ব্লকভিত্তিক প্রোগ্রামিং ভাষা সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

অনলাইনে পণ্য বিক্রি করে সফল টাঙ্গাইলের নারী উদ্যোক্তা

জেলায় অনলাইন ভিত্তিক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা দিন দিন বাড়ছে। গত তিন-চার বছর ধরে পোশাক, আচার, কেকসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, অর্গানিক অয়েল, কসমেটিক্স, জুয়েলারী, কাসা ও পিতলের জিনিসপত্র, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, পাটের তৈরি জিনিসপত্রসহ নানান পণ্যের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উইমেন এন্ড ইকমার্স ট্রাস্ট ফোরাম (উই) ফেসবুক ভিত্তিক পেইজে যুক্ত হয়ে ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন জেলার অনেক নারী উদ্যোক্তা।

এতে ঘরে বসেই পরিবারের কাজের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন তারা। অল্প পুঁজিতেই নারীরা অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে সফল হয়েছেন।

কেউ কেউ ৮০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা আয় করছেন। জেলার প্রায় দুই শতাধিক নারী উদ্যোক্তা এভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছেন। দিন দিন বাড়ছে এদের সংখ্যা।

স্থানীয়ভাবে মূলতঃ অনলাইনে মানুষের খাদ্যপণ্য ও পোশাকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে করোনাকালীন সময়ে অনেক নারীই ঘরে বসে উদ্যোক্তা জীবন শুরু করেন। যা এখনো ধরে রেখেছেন নারী উদ্যোক্তারা।

জেলার সখীপুর উপজেলার নারী উদ্যোক্তা সানজিদা আহমেদ জুই একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে জেলা ও জেলার বাইরে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন।

তিনি বলেন, আমার ছোট বেলা থেকে ইচ্ছে ছিল পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু একটা করবো। কোথাও চাকরি করলে অন্যের অধীনে কাজ করতে হয়।

আমার লক্ষ্য ছিল অন্যের অধীনে কাজ না করে নিজে নিজে কিছু একটা করার। ২০২০ সালের দিকে করোনাকালে 'উই' নামের একটি ফেসবুক গ্রুপ খুঁজে পাই।

আমার স্বামী ও বাবা-মার কাছে পরামর্শ নিয়ে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকে কাঁথাসহ ছোট বাচ্চাদের পোশাক নিয়ে কাজ শুরু করলাম।

একটি ফেসবুক পেইজ খুললাম। প্রথম দিনেই অর্ডার আসে অন্য জেলা

থেকে। প্রথম বিক্রি ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। এতে কাজের প্রতি উৎসাহ পাই। শুরু হলো কাজ করা।

আমার ৯৫ ভাগ পন্য বিক্রি হয় অনলাইনে, আর ৫ ভাগ বিক্রি হয় অফলাইনে। এখন প্রতি মাসে আমার ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি হয়।

লাভ থাকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। বর্তমানে আমার প্রতিষ্টানে প্রায় ৫০জন নারী কর্মীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি নকশি কাথা, সরিষার বালিশ, শিমুল তুলার বালিশ, ফ্যামেলি কম্বো ড্রেস, পাটের ব্যাগ, হাতের কাজের জুয়েলারিসহ বিভিন্ন রকমের পণ্য নিয়ে কাজ করি।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিসিক থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণও নিয়েছি। পৌর শহরের পশ্চিম আকুর-টাকুর পাড়া এলাকার নারী উদ্যোক্তা নাহিদা ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালের দিকে পোশাক নিয়ে কাজ করে ভালোই চলছিল।

তারপর আমার বাচ্চা হলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, দুই বছর আগে করোনার সময় অনেকের দেখাদেখি আমিও অনলাইনে যুক্ত হয়ে জোড়ালোভাবে ব্যবসা শুরু করলাম।

এখন অনলাইনে বিভিন্ন খাদ্যপণের ব্যবসা করেছি। বর্তমানে সংসারে কাজের ফাঁকে আমি সব ধরনের বাংলা খাবার, চিকেন ফ্রাই, বিফ কারি, ভেজিটেবলস, সালাদ, বিভিন্ন ধরনের বিরিয়ানী, পোলাউ, শর্মাসহ অর্ডার মোতাবেক বিভিন্ন মজাদার খাবার তৈরি করি। বি

য়ে অনুষ্ঠানসহ বিভিন্নে অনুষ্ঠানের খাবারেরও অর্ডার নিয়ে থাকি। কাজ করতে পারলে প্রতিমাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে পরিবারের সহায়তা প্রয়োজন।

অর্গানিক প্রোডাক্ট বিডি'র স্বত্বাধিকারী ও কলেজ ছাত্রী ঋতু বর্ণা বলেন, আমি গত তিন বছর ধরে লেখাপড়ার পাশাপাশি অনলাইনে অর্গানিক হেয়ার অয়েল, অর্গানিক হেয়ার প্যাক, অর্গানিক ক্রিম, অর্গানিক বডি লোশন ও ঝাল মুড়ির মসলার ব্যবসা করছি।

ভালোই সাড়া পাচ্ছি। আমাদের 'উইমেন এন্ড ই-কমার্স ট্রাস্ট ফোরাম (উই) নামে একটি গ্রুপ রয়েছে, ফেইজবুকে যার সদস্য ১ মিলিয়নের উপরে।

এটা আমাদের অনলাইনে ব্যবসার একটি বড় প্লাটফর্ম। এর মাধ্যমে অনেক বিক্রেতারাই পণ্য বিক্রি করছেন সহজে। আমাদের নিজস্ব ফেসবুক পেইজেও পণ্যের ছবি দিয়ে থাকি, ওখান থেকেও ভালো সাড়া পাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষই অনলাইনের প্রতি ঝুঁকছেন, এতে এই খাত আরো বড় হচ্ছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি অনলাইন থেকে বাড়তি আয় হচ্ছে।

বর্তমানে আমার মতো অনেক ছাত্রী অনলাইন ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন। আমাদের যদি সরকারিভাবে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আরও এগিয়ে যেতে পারবো।

চাকরি পিছনে না ছুটে নিজেরাই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবো। উই'র টাঙ্গাইল জেলা প্রতিনিধি ও 'স্বপ্নের সন্ধানে' নামের একটি পেইজের স্বত্ত্বাধিকারী মাহবুবা খান জ্যোতি বলেন, বাসায় স্বামীকে খাওয়ানোর জন্য আচার করে সেই ছবি ফেসবুকে দিয়েছিলাম।

আর সেখান থেকেই অর্ডার পাই বেশ কয়েক ধরনের আচারের। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মাত্র ২৬০ টাকার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে এখন প্রতি মাসে প্রায় লাখ টাকা আয় করছেন জ্যেতি।

সংসার সামলেও ব্যবসায়ীর খাতায় নাম লিখিয়েছেন এই নারী উদ্যোক্তা। বর্তমানে তিনি টাঙ্গাইল পৌর শহরের পূর্ব আদালত পাড়া এলাকার একজন পরিচিত মুখ।

জ্যোতির কাছে মিলবে পছন্দ অনুযায়ী ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যকর কেক, বিভিন্ন রকমের আচার, আমসত্ত্ব, হাতের তৈরি ডিজাইনের শাড়ি, পাঞ্জাবি ও বাচ্চাদের ফতুয়া। খাবারসহ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে কাজ করছেন তিনি।

জ্যোতি বলেন, ২০২০ সালের প্রথম দিকে জয়েন করেছেন 'উই' নামক ফেসবুক গ্রুপে। গ্রুপটিতে যুক্ত হওয়ার পর জানতে পারেন ক্ষুদ্র ব্যবসার ইতিবৃত্ত।

প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করতে শুরু করেন আচার, আমসত্ত্ব। ইতোমধ্যে তার আমসত্ত্ব সাড়া ফেলেছে টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলায়। দেশের বাইরেও এর কদর বেড়েছে। আমসত্ত্ব ও আচারের গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্ট তার ভোক্তারা। তাই অর্জন করেছেন টাঙ্গাইলের 'আমসত্ত্ব জ্যোতি' খেতাব।

ক্রেতাদের কাছ থেকেই পেয়েছেন এ নাম। তবে টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলা ও বিদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকেন তিনি। এটাকে আরও প্রসারিত করার চিন্তা তার।

তিনি বলেন, আমাদের টাঙ্গাইলে প্রায় ২২০ জন নারী উদ্যোক্তা কাজ করছেন। বিসিক থেকে আমাদের ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।

নারী উদ্যোক্তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে থাকে বিসিকি। টাঙ্গাইল জেলা বিসিক কার্যালয়ের শিল্প নগরী কর্মকর্তা জামিল হুসাইন বলেন, দিন দিন টাঙ্গাইলে নারী উদ্যোক্তা বাড়ছে।

নারীরা অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িত হয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তাদেরকে বিসিক থেকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।

ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বাড়াতে আউটলুকে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসছে মাইক্রোসফট

মাইক্রোসফট ব্যবহারকারীদের নিরাপদ রাখতে আউটলুকে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছে। এসব পরিবর্তনের ফলে শিগগিরই আউটলুকের বেসিক অথেনটিকেশন সমর্থন সুবিধা বন্ধের পাশাপাশি আউটলুকের 'লাইট' সংস্করণ মুছে ফেলা হবে।

আউটলুকের সঙ্গে জিমেইল অ্যাকাউন্টও যুক্ত করতে পারবেন না ব্যবহারকারীরা। মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, ই-মেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত বেসিক অথেনটিকেশন প্রযুক্তির নিরাপত্তা তুলনামূলক কম।

আর তাই আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আউটলুকে বেসিক অথেনটিকেশন সমর্থন সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আউটলুকে আধুনিক অথেনটিকেশন মেথড ব্যবহার করা হবে।

ফলে অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ছাড়াও একাধিক পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীদের পরিচয় যাচাই করা হবে। এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বর্তমানের তুলনায় আরও বাড়বে।

আউটলুকের লাইট সংস্করণের ওয়েব অ্যাপ মুছে ফেলা হবে আগস্টের ১৯ তারিখে। লাইট সংস্করণটি মুছে ফেলার পর ব্যবহারকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে আউটলুক ওয়েব অ্যাপের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে।

এটি অ্যাকাউন্টকে আরও সুরক্ষিত রেখে বাড়তি নিরাপত্তা দেবে। এ ছাড়া আউটলুকে এখন জিমেইল অ্যাকাউন্ট যুক্ত করার সুযোগ থাকলেও ৩০ জুন এ সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে।
এর ফলে আউটলুকের মাধ্যমে আর জিমেইলে প্রবেশ করা যাবে না। আউটলুকের পার্টনার গ্রুপ প্রোডাক্ট বিভাগের ব্যবস্থাপক ডেভিড লস বলেছেন, নতুন এসব পরিবর্তন আসার পর আউটলুক ব্যবহারের জন্য উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের অবশ্যই উইন্ডোজ ১০ থেকে পরবর্তী সংস্করণের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।

মাইক্রোসফট এজ ও ক্রোম ব্রাউজারের সর্বনিম্ন ৭৯ সংস্করণ এবং ফায়ারফক্স ব্রাউজারের সর্বনিম্ন ৭৮ সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে।

লজিটেক নিয়ে এসেছে তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউস

লজিটেক নিয়ে এসেছে কমপিউটারে দ্রুত বাংলা লেখার সুযোগ দিতে তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসের কম্বো। গত মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'লজিটেক এমকে২২০' মডেলের তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউস উন্মোচন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানে লজিটেকের দক্ষিণ এশিয়া ফ্রন্টিয়ার মার্কেটের বিটুবি ও বিটুসি বিভাগের প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'বাংলাদেশের বাজারে লজিটেকের তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসের কম্বো আনতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বিজয় বায়ান্নর লেআউট দিয়ে তৈরি করা কি-বোর্ডটি পানিরোধক হওয়ায় স্বাচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। ২.৪ গিগাহার্টজের একটি ডঙ্গলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ মিটার দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি-বোর্ড ও মাউসটি। ফলে কি-বোর্ড ও মাউসটির মাধ্যমে বাসা বা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করা যাবে। তবে এটি গেমারদের জন্য নয়।' অনুষ্ঠানে জানানো হয়, তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসটিতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যালকালাইন ব্যাটারি।

ফলে কি-বোর্ডটির ব্যাটারি ২৪ মাস ও মাউসের ব্যাটারি ১২ মাস পর্যন্ত একটানা ব্যবহার করা যাবে। তারহীন কি-বোর্ড ও মাউস কম্বোটির দাম ধরা হয়েছে ২ হাজার ২৪৯ টাকা।